সমুদ্র আর ঢেউ

শক্তিপদ রাজগুরু

দেশ প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীবংশীবিহারী সাহা
দেশ প্রকাশনী
১৪৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

●

সহায়তা করেছেন :
মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

●

মুদ্রক :
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯, গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

●

প্রচ্ছদ শিল্পী
বিশ্বনাথ দাস

॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ ॥
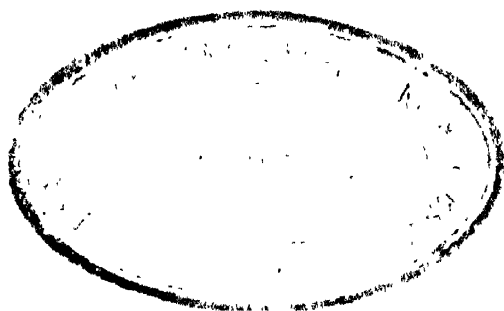
লেখক অনেক কিছুই দেখেছেন। আর সেই দেখার অভিজ্ঞতাকে তিনি নানানভাবে পাঠক-সমাজে আপন তুলিতে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন। 'সমুদ্র আর ঢেউ' সেই জাতের লেখা যার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক নেই।

—প্রকাশক

ঃ এই লেখকের ঃ

সমুদ্র আর ঢেউ

মণি বেগম

কেউ ফেরে নাই

কাজল গাঁয়ের কাহিনী

অন্তরে অন্তরে

শেষ নাগ

মেঘে ঢাকা তারা

কুমারী মন

অবাক পৃথিবী

রায় মঙ্গল

শাল পিয়ালের বন

অমৃতের স্বাদ

ক্লান্ত প্রতাপনারায়ণ এসে দেউড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পথটুকু পার হয়ে প্রকাণ্ড থামঘেরা বাড়িটায় উঠলো। সামনেই মস্ত বাগান, বাগানের পর উঁচু রেলিং লাগানো সীমা-প্রাচীর।

রকমারি গাছ-গাছালি, কর্তাবাবু কন্দর্পনারায়ণের শখ ছিল বাগ-বাগিচার। বহু খরচ করে দেশবিদেশ থেকে নানারকমের গাছ আনিয়েছিলেন তিনি।

রেডউড, আফ্রিকান বেনিয়ান, স্যাগুাল—তেজপাতা—ইউ-ক্যালিপটাস থেকে শুরু করে রকমারি অর্কিড, ক্রোটন, ক্যাকটাস—মায় বহু যত্নে পালিত কয়েকটা ক্যামেলিয়া, রোডোডেনড্রন, ম্যাগ্নিফ্লোরা, আর্ল অব বাকিংহাম পর্যন্ত। কর্তার আমল কেটে গিয়ে তাঁর ছেলেদের আমল পড়েছে। গাছগুলো কেউ উতরে গেছে। কেউ প্রাণে মাত্র বেঁচে আছে, কোনরকমে ধুঁকছে। কেউ বা শেষ হয়ে গেছে। ওপাশে গোলাপ-বাগানের অস্তিত্বটুকু এখনও টিকে আছে। আকাশের দিকে মাথা তুলেছে কয়েকটা স্বর্ণচাঁপা; গ্রীষ্মের প্রথম ছোঁয়ায় ওর ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটেছে গাঢ় সোনা রংয়ের ফুলগুলো—বাতাসে তাদের উদগ্র সৌরভ।

দারোয়ান ছোটবাবুকে দেউড়ির কাছে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে সেলাম করলো। ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতের মুঠোয় খৈনির দলাটা সামলে নিল—প্রতাপনারায়ণ চেয়েও দেখলো না। ঘামে আদ্দির কলকাদার পাঞ্জাবি ভিজে গেছে, টকটকে ফরসা রং—দীর্ঘ সাড়ে ছ-ফুট চেহারায় এখনও বয়সের রং ধরতে পারেনি। সামনে এসে ওই পরাক্রমশালী পুরুষটিকে দেখে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে বয়সের পরওয়ানাদার।

সহিস তেজী ঘোড়াটার লাগাম ধরে সামলাবার চেষ্টা করে। দামী ওয়েলার ঘোড়া—কদমে ছুটে এসেও দমেনি। চার পা ক্রমান্বয়ে ঠুকে চলেছে পাথরের রাস্তায়, খুরের খট খট শব্দ ওঠে; সামনের রূপালী কেশরগুলো ঝুঁকে পড়ে চোখের উপর—ঝাঁকানি দিয়ে সেগুলো পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে ব্যস্ত চঞ্চলভাবে লাগামের কড়াটাকেই দাঁতে চিবুচ্ছে।

প্রতাপনারায়ণ হাত নেড়ে তাকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে যেতে বলে। সেও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বাবুর দিকে। কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। নইলে এসময় বাবু বের হন না।

আস্তাবলের ওপাশের ঘরে বসে অনুকূল ডোম নিজের কাজ করে চলেছে। এস্টেটের মাহিনাকরা লোক সে। মাস-মাহিনা—অতিথশালায় খাবার ব্যবস্থা ছাড়াও গ্রামের জঙ্গলমহালে কিছু চাকরান জমি ভোগ করে। বাবুর সহায়—দেহরক্ষী। এ অঞ্চলের নামকরা শিকারী। ওর চাকরি বহালের একটা ইতিহাস আছে। এ বংশের সুনামের সঙ্গে সেই ইতিহাস জড়িত। বহুদিনের হারানো সেই ইতিহাস।

কন্দর্পনারায়ণ ছিলেন দুঁদে জমিদার। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জমিদারি। এপাশে বর্ধমানরাজ অন্য দিকে পঞ্চকোটরাজ—এই দুই এলাকার মধ্যে এঁদের জমিদারি, দামোদর থেকে শুরু করে অজয় নদের সীমানা পর্যন্ত। গভীর জঙ্গল—গড়ের জঙ্গল, ইছাই ঘোষের গড়, রাঢ়েশ্বর শিবের এলাকা সবই এদের পত্তনি। বছরে আদায় উশুলও প্রায় লাখটাকার মত। তেমনি দফরফের জমিদার। বাঘে-বলদে একঘাটে জল খাওয়াবার কথা এঁদের পক্ষেই সম্ভব।

সেই পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ দামোদরের মানাচর দখল নিয়ে মস্ত ফৌজদারিতে পড়েন। বেশ কিছু খুন-খারাবি—লাশ দাখিল হয়ে যায়। হটে যায় প্রতিপক্ষ প্রজার দল। তাদের হত্যা করেও

ক্ষান্ত হননি কন্দর্পনারায়ণ, নদীর ধারে জঙ্গলের বাইরে অঙ্গদপুর-প্রতাপপুরের উদ্ধত প্রজাদের শাসন করবার জন্যই রাতের অন্ধকারে গ্রামকে গ্রাম আগুন লাগিয়ে দেন—অন্য অত্যাচার তো আছেই।

তখন পর্যন্ত অনুকূল এসবের মধ্যে থাকতো না। তার পেশা ছিল বনের গাছ চোরা-কাটাই করে মহাজনদের বিক্রি করা, সেই সঙ্গে বাঘ-বনশুয়োর—মাঝে-মিশলে পশ্চিমের বন থেকে ছটকে-আসা শিঙেল হরিণ—শজারু—নিদেনপক্ষে খরগোশ শিকার করে বিক্রি করা। এই ছিল তার নেশা আর পেশা। গাদাবন্দুক একটা পেয়েছিল, পুরুষানুক্রমে সেইটাই ভোগদখল করে কাজে লাগিয়ে রুজি-রোজগার করতো। বনে-বাদাড়েই দিনরাত কাটতো তার।

হঠাৎ একদিন মামড়ার কাছে গভীর জঙ্গলের বুকে একটা আর্তনাদ শুনে চমকে ওঠে। বনগড়ানী স্রোতের তিরতিরে ধারার কাছে ওৎ পেতে বসেছিল, কদিন থেকেই নরম মাটিতে পায়ের দাগ দেখে বুঝেছিল চিতাবাঘই নামছে, শিকারের আশায় কিছুদিন তাকবাগ্ করে সেদিন ঘাঁটি আগলে বসেছে অনুকূল—হঠাৎ অদূরে পায়েচলা পথ থেকে একটা চীৎকার, ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে চমকে ওঠে।

নিশ্চয়ই বাঘটা কোন পথচারীকে উল্টে শিকার করে বসেছে—নিজে অনুকূলের শিকার না হয়ে। অনুকূল শাল-ঝোপের ফাঁক দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলে সন্তর্পণে—একটুও যেন শব্দ না ওঠে। তাহলেই রক্তলোভী বাঘ তাকেও আক্রমণ করবে—না হয় 'কিল' ফেলে রেখেই পালাবে। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। গাদা-বন্দুকের মসলার ভিতর একটি কি দুটি সীসের গুলিমাত্র সম্বল—তবু নিজের উপর অসীম ভরসা তার। একটি গুলিতেই সে বহু বাঘ খতম করেছে, দুটি চোখের মধ্যেকার একটু জায়গা—সেইখানেই তাগ করে সে—সে লক্ষ্য ব্যর্থ আজ পর্যন্ত হয়নি। নিপুণ শিকারীর

মত এগিয়ে যায় বন্দুকহাতে ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে চুপিসারে, যেন কোনশব্দও না ওঠে।

হঠাৎ শাল-ঝোপের ফাঁক থেকে সামনে চেয়েই অবাক হয়ে যায়. বাদামী রংয়ের বড় ঘোড়াটা লাফ দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে—কিন্তু একটা মহুয়া গাছের ডালে লাগামটা আটকানো, দেখেই চমকে ওঠে—জমিদার কন্দর্পনারায়ণের ঘোড়া—সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু রক্তে ভরে উঠেছে, দুজন লোক কন্দর্পনারায়ণকে মাটিতে ফেলে নিষ্ঠুরভাবে মেরে চলেছে, পাথর দিয়ে ঠুকছে দেহটাকে ; মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে জ্ঞানহীন দেহটা ; বাঘের চেয়ে নিষ্ঠুর ওই লোকগুলো।

তার বন্দুকের আওয়াজে বনভূমি কেঁপে ওঠে। গাছের ডালে বসেছিল কয়েকটা হরিয়াল পাখী, পত পত শব্দে উড়ে গেল, উঁচু 'রিজে'র বুক থেকে শব্দটা ঘা খেয়ে ফিরে আসে।

অতর্কিতে গুলি লেগে লোকটা ছিটকে পড়ে—অন্য জনও ভয় পেয়ে উঠে পড়ে কোন দিকে না চেয়ে সোজা ছুটে বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইতিমধ্যে অনুকূল আবার বন্দুক বোঝাই করে নিয়ে এগিয়ে যায়।

আহত লোকটা পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায় ; কোমরে গুলি লেগেছে—উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অঙ্গদপুরের ক্ষেত্র আগুরী। দশাসই চেহারা—যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে ওর মুখ—আর্তনাদ করে।

—আর এক গুলিতে আমাকে সাবাড় করে দে অনা, দুটি পায়ে পড়ি তোর।

অনুকূল কন্দর্পনারায়ণের জ্ঞানহীন দেহটার দিকে চেয়ে থাকে। কি ভেবে আহত লোকটাকে মহুয়া গাছের সঙ্গে বেঁধে আটকে রেখে ঘোড়াটা খুলে নিয়ে উধাও হয়। কাছেই কাছারিবাড়ি, খবর দিতে হবে।

তারপর কয়েক বছর কন্দর্পনারায়ণ বেঁচে ছিলেন। আহত ক্ষেত্র আগুরীকে ওরা জ্যান্ত বনের মধ্যে পুঁতে ফেলেছিল। অমুকূল ডোম সেই থেকে আশ্রয় পেয়েছে এ বাড়িতে—নিমক খেয়েছে, তার মর্যাদাও রেখেছে। তার কাজ ওই হাতিয়ার নিয়েই। তাই ছোটবাবুরই বিশ্বস্ত অমুচর পার্শ্বচর হয়ে উঠেছে অনা ডোম।

বড়বাবু বিক্রমনারায়ণ আর ছোটবাবু প্রতাপনারায়ণের মধ্যে প্রতাপনারায়ণের সঙ্গেই অমুকূলের বিশেষ সম্বন্ধ। বড়বাবু বাবার আমল থেকেই বিষয়ী লোক। মামলা-মকর্দমা—বাকী কর—পত্তনি দেওয়া—কাছারির আদায় উশুল—তমস্সুক নিয়েই ব্যস্ত। সম্পত্তি রাখতে জানে—সম্পত্তি অর্জন করেছে লাঠি বন্দুক দিয়ে ওই প্রতাপনারায়ণ আর অমুকূল; বড়বাবু তার তদ্বির তদারক আর রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। প্রজাকে হাতে না মেরে ভাতে মেরেছে। তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে।

প্রতাপনারায়ণ বাবার উপর আক্রমণের পর চেয়েছিল অঙ্গদপুর আবার জ্বালিয়ে দিতে, বিক্রমনারায়ণের হাতে থানাপুলিস—মহকুমার হাকিম মায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবধি। ঘন ঘন তাঁরা আসেন খানা খেতে—জঙ্গলে শিকার করতে। বিক্রম চায় বিষয়-আশয় রক্ষা করতে। বাড়াতে। গোলমাল ঠিক পছন্দ করে না সে।

তাই সে বাধা দেয় প্রতাপকে—বেআইনী কাজ করো না। ওতে খরচই হয়, বাজে খরচ।

প্রতাপ চুপ করে যায়।

বাবাকে মারবার ষড়যন্ত্রে যারা ছিল তাদের সকলকেই প্রায় সাবাড় করেছে—বাকী আছে গোবিন্দ ঘোষ। এ অঞ্চলের মস্ত ধনী গোয়ালা; দামোদরের মানাচরে তার হাজার বিঘে খাস জমি, পাঁচশো গরু মোষ, প্রজা লোকজন। তাকে এখনও সায়েস্তা করা হয়নি।

সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব—মহকুমা হাকিম—সাবজজ সাহেব—পুলিস সুপার সকলে এসেছেন এ বাড়িতে নিমন্ত্রণে, শিকারের আয়োজন হচ্ছে। বনতাড়াবার জন্য জুটেছে কয়েকশো লোহার-বাউরি, লাঠি সড়কি ঢাল ক্যানাস্তারা টিন দগড়-জয়ঢাক নিয়ে। খাওয়াদাওয়ার পর তাঁরা বের হবেন। প্রতাপনারায়ণও মস্ত শিকারী। পুলিস সুপারের সঙ্গে কখনও বা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে গল্পগুজব করছে—কবে এই বনে দশ ফুট বাঘ মেরেছিল তারই কথা বলছে।

হঠাৎ এরই মধ্যে খবর হয়ে যায় গোবিন্দ ঘোষের মানাবনে কারা চড়াও হয়ে তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—গোবিন্দ ঘোষকে গুলি করে হত্যা করেছে। সাক্ষ্য দেয় গোবিন্দের ভাইপো—ওই প্রতাপবাবুই নিজে গুলি করেছেন। হৈ হৈ ব্যাপার।

অবাক কাণ্ড। ম্যাজিস্ট্রেট হাকিম সাবজজ পুলিস সুপারই সাক্ষী, প্রতাপনারায়ণ সেই সময় তাঁদের কাছেই ছিল। তাঁরাও এর সাক্ষ্য বিশ্বাস করতে পারেন না। কখন এ ব্যাপারটা ঘটেছে তাও জানেন না তাঁরা। সর্বদাই প্রতাপ সেদিন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। ব্যাপারটা সত্য বলে মনে করেন না তাঁরা। ব্যাপারটা জানে একমাত্র অনুকূল। কোন্ মুহূর্তে প্রতাপনারায়ণ তার ঘোড়া নিয়ে নিমেষের মধ্যে গোবিন্দকে শেষ করে এসেছে একমাত্র সেই জানে। রাইফেল নয়—ব্রিজলোডার বন্দুকের একটি গুলিতে।

সে মামলা কোন্ দিকে উপে যায় কর্পূরের মত। লোকে অনেকেই পরে অনুমান করে ব্যাপারটা, কিন্তু কোন কথা বলবার উপায় নেই। যে মুখ দিয়ে কথা বের হবে—বন্দুকের একটি গুলিতে সেই মুখ দিয়ে আর কোন কথাই কোনদিন বের হবে না—চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

বিক্রমনারায়ণ ব্যাপারটাকে ঠিক ভাল চোখে দেখে না। তার

নজর অন্যদিকে। এস্টেটের যে অবস্থা শুরু হয়েছে বাবা মারা যাবার পর, তাতে এত বড় ব্যাপার দেখাশোনা করে টিকিয়ে রাখা যাবে না। চারিদিক থেকে ঝড় আসছে—এই ঝড় কখন কি ভাবে আসবে জানে না—তবে এটা বেশ জানে এই দিন বদলাবে।

তাই এখন থেকে সরকার পুলিসের সাহায্য নিয়ে সে অন্য কোন পথ খুঁজে নেবে। গ্রামের পাশ দিয়ে চলেছে শাহীসড়ক। ইংরেজীতে যাকে বলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ছেলেবেলায় বর্ধমান থেকে রানীগঞ্জ আসানসোল—ওপরে ম্যান সাহেবের লোহা-কারখানা কুলটি ছাড়িয়ে যেতে দেখেছে উটের দোতলা গাড়ি। রাত্রিবেলায় মাঝে মাঝে বাঁশির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে—দোতলার জানলা দিয়ে চেয়ে দেখেছে অর্জুন মুরগা শিরীষ চাকলতা আম গাছের সারি দেওয়া খোয়াঢাকা চওড়া শাহীশড়ক ধরে চলেছে কয়েকখানা উটের গাড়ি সোয়ারী নিয়ে। বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলেছে গাড়োয়ানরা। উট নাকি বাঁশির শব্দেই ভালো চলে।

সেই দিন বদলে গেছে। এখন ম্যান সাহেবের লোহা-কারখানা ছাড়াও মার্টিন সাহেবের কারখানা হয়েছে আসানসোলের কাছে। কয়লাও উঠছে প্রচুর। কালীপুরের পাশ দিয়ে আজকাল সারিবন্দী মালগাড়ি যায় কয়লা নিয়ে; নতুন ব্যবসা গজাচ্ছে; মোটর-বাস দেখা দিয়েছে পথে।

বিক্রমনারায়ণ বাড়তি রোজগারের পথ হিসাবে মোটর বাসই কিনবে কয়েকখানা। তারই কেনাকাটা—লাইনে চালানোর ব্যাপারে সাহেবসুবোদের সাহায্য নেবার জন্যই শিকার পার্টির আয়োজন করেছিল, আসল কথায় আসবে বিক্রমনারায়ণ সন্ধ্যার পর, মাংস আর বিলেতী পানীয় সরবরাহ করে; কিন্তু ততদূরে আসবার আগেই প্রতাপনারায়ণ এই কর্ম বাধিয়ে এল। একেবারে খুন-খারাবি প্রকাশ্য দিনের আলোয়। তার সব মতলব যেন বরবাদ করে দিল প্রতাপ ইচ্ছে করেই।

সেদিন বিক্রমনারায়ণ প্রতাপকে বলে ওঠে,

—এ সব ভালো নয় প্রতাপ। এ সব বন্ধ করতে হবে।

প্রতাপ দাদার দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে; দাদার মনঃক্ষুণ্ণতার কারণ কিছুটা অনুমান করে সে। বুঝতে পেরেছিল দাদার মনোভাব। তবু জবাব দেয়—

বাবাকে ওরা মারতে চেয়েছিল তার শোধ নিয়েছি। এতে অন্যায় করলাম কোন্‌খানে?

—বাবাকে ওরা কবে কোন্‌কালে মারতে চেয়েছিল, আজ সে বহু বৎসর অতীতের কথা। এর জের টেনে আনার মত সময় উৎসাহ কোনটাই বিক্রমনারায়ণের নেই। চুপ করে থাকে সে—প্রতাপকে বেশী ঘাঁটাতে সাহস তার নেই, তাই মনে মনে স্থির করে বিক্রমনারায়ণ ওকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়ঃ। বলে ওঠে—

—এখন এই মালিমকর্দমায় এত খরচ কোত্থেকে আসবে?

—এস্টেট থেকে, না হয় আমার সম্পত্তির অংশ থেকে।

বিক্রম এক নিমেষের মধ্যে কি যেন একটু আলোর সন্ধান পায়। চুপ করে কি ভাবতে ভাবতে বলে—দেখা যাক্।

প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে ওর আকৃতি এবং প্রকৃতিগত অমিল রয়েছে অনেকখানি। বিক্রমনারায়ণের স্বাস্থ্য তেমন নয়, কথাবার্তাও কেমন মিনমিনে। তার তুলনায় প্রতাপনারায়ণ স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অধিকারী। তেমনি দরাজ দিলেরও। সামন্ততান্ত্রিক রক্তের যোগ্য উত্তরাধিকারী সে—মনের দিক থেকে তেমনি একটা বিশালতা ওই দেহের মতই প্রকাশ পায় ক্ষেত্রবিশেষ। তার তুলনায় বিক্রমনারায়ণ একটা ব্যর্থ সৃষ্টি; এ বংশের ধারার সঙ্গে কেমন বেমানান। কুটিল—তীক্ষ্ণবুদ্ধি—যেন লোভী মহাজন। জীবনটাকে লাভ আর সম্পদের স্বপ্নে কুঁকড়ে ফেলেছে।

নিজের চিন্তাতেই বিভোর।

অনুকূল, বাবুর আজকের গতিবিধির খবর জানতো, একাই

গিয়েছিল প্রতাপনারায়ণ। বনতরফের কাছারিবাড়ির জঙ্গলে ক-দিন থেকেই একটা বাঘিনী উৎপাত করছে। আজ সকালেই ছোটবাবুর কাছে খবরটা পৌঁছে দেয় অনুকূলই—কাল রাত্রে কাছারির গোয়াল থেকে মস্ত একটা বলদকে মেরে ঘাড়ে করে পাঁচিল পার হয়ে উধাও হয়েছে বাঘটা। রক্তের দাগ ধরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করে অনুকূল গড়ের গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা ধ্বংসপুরীতে।

খবর পেয়ে বাবু নিজেই গিয়েছিল দেখে আসতে। অনুকূলের পাশে নামানো কয়েকটা রকমারি বন্দুক-রাইফেল। সকাল-বেলাতেই তার কাজ যন্ত্রপাতিগুলোর তদ্বির—দেখাশোনা করা, তেল পালিশ লাগানো। আজ তাই করছিল—বন্দুকের নলের ভিতর তুলিলাগানো রডটা চালাতে চালাতে ভাবছিল বাঘটার কথা, বেশ বড় বলেই মনে হয় জানোয়ারটাকে।

এমন সময় দুপুর রোদে ঘোড়াদাবড়ে ছোটবাবুকে ফিরতে দেখে বন্দুক ফেলে রেখে অনুকূল বার হয়ে এল। যাবার আয়োজন করতে হবে—হয়তো বা মাচাই বাঁধা দরকার, তারই নির্দেশ নিতে হবে। অনুকূলকে এগিয়ে আসতে দেখে ছোটবাবু একবার মুখ তুলে চাইলো।

কেমন যেন ক্লান্ত চেহারা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহখানা যেন ওই মানুটিকে বইতে পারছে না। একবার দাঁড়িয়ে নির্বাক অনার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—পরে খবর দোব।

আর কোন কথাই বললো না ছোটবাবু, সোজা সদর কাছারির বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পিছনের মহালে চলে গেল মার্বেল পাথর বসানো সিঁড়ি বেয়ে।

অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অনুকূলও। কি যেন একটা কিছু ঘটেছে। একটা অসাধারণ অস্বাভাবিক কিছু। ভেবে-চিন্তে অনুকূলও ঠাওর করতে পারে না। পায়ে পায়ে গিয়ে খোলা বন্দুকের নলটা তুলে নিয়ে সাফ করতে থাকে—কাজে আর মন বসে না।

প্রতাপনারায়ণ এগিয়ে চলেছে দোতলার প্রশস্ত বারান্দা দিয়ে। দেওয়ালে বাঘের চামড়া—কোথায়ও নিজের হাতে শিকার করা আসামের জঙ্গলে দুটো বুনো মোষের মস্ত শিঙ, হরিণের মাথা। মোটা থামের উপর পঙ্কের কাজ করা, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে ঝাড়; সামনের ঘরের দরজার সামনে এসে থামল।

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে প্রতাপনারায়ণ, ঘামে পাতলা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ভিজে বসে গেছে দেহের সঙ্গে। ভারী খসখসের ভিজে পর্দা থেকে উঠছে মিষ্টি একটা গন্ধ। বিক্রমনারায়ণের কাছারির খাস কামরা। নীচের তলায় কর্মচারীরা কাজ করছে—নায়েব ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, খাজাঞ্চির রেলিংঘেরা জায়গার সামনে দু-চারজন লোক কাগজ হাতচিটা হাতে খাড়া দাঁড়িয়ে। কখন বেলপাতা পড়বে ঠাকুরের মাথা থেকে যেন তারই আশায় ধরণা দিয়েছে—তাদের প্রাপ্য টাকা পাবার জন্যে।

এ সময় বিক্রমনারায়ণ প্রতাপকে ওই অবস্থায় ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। প্রতাপকে ভয় করে প্রথম থেকেই—ওর দুর্দম বন্যপ্রকৃতিকে ঠিক সহ্য করতে পারে না বিক্রম, মানিয়েও নিতে পারে না। তাই এড়িয়ে চলে পারতপক্ষে। তবে বিক্রম রাগলে বা ভয় পেলে মুখে তাঁর কোন চিহ্ন ফুটে ওঠে না। বেশ সহজ ভাবেই বলে ওঠে—বসো, বসো। শুনলাম জঙ্গলমহালে একটা গেছো বাঘ নাকি বড় উৎপাত করছে।

—হ্যাঁ। কিন্তু না গেলেই যেন ভালো হতো। তুমিও খুশী হতে।

প্রতাপের উদ্ধত কণ্ঠস্বরে যেন চমকে ওঠে বিক্রম। একটু সামলে নিয়ে সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে—কেন? কি হলো? প্রতাপ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে,

—শুনলাম জঙ্গলমহালের বেশীরভাগই নাকি বন্দোবস্ত করে দিয়েছো? এটা কি সত্যি?

—মানে ? কে বললে ?

প্রতাপের মুখে চোখে অবিশ্বাসের ছায়া। বেশ সতেজ কণ্ঠেই বলে ওঠে প্রতাপনারায়ণ—কেন প্রজারাই বলছে শুনলাম। ওখানকার কাছারির নায়েবও।

ধূর্ত বিক্রম প্রতাপের দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। পরক্ষণেই ব্যাপারটাকে সামলাবার জন্য সহজ হয়ে ওঠে।

বিক্রমের মুখে হাসির আভা। বেশ তারিয়ে তারিয়েই বলে—এই কথা ! মানে কাঠ কাটার জন্য খানিকটা বিক্রি করেছি ! কাঠ বিক্রি করবো না। তাই বলে ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন ! হাঁসের ডিম বেচতে দোষ কি ? হাঁসটা কি বেচবো তাই বলে ? এত বোকা পেয়েছো আমাকে ?

প্রতাপের মুখ থেকে রাগের চিহ্ন মুছে যায়। ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসে মুখ চোখের ভাব। কাঠ বিক্রি প্রতিবৎসরই করে তারা—বেশ কয়েক হাজার টাকার কাঠ। বনের দখল বিক্রি করেনি।

প্রতাপের কাছে তাহলে মিথ্যেই বন বিক্রির খবর এসেছিল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় প্রতাপ।

বিক্রম বলে চলেছে—কার কাছে কি শোন আর তাই বিশ্বাস করো। এই করে জমিদারি রাখা যায় ?

প্রতাপনারায়ণ দাদার কথার জবাব দেয় না।

বিক্রমই শাসনের সুরে বলে ওঠে—যাও, বেলা হয়েছে, স্নান খাওয়া সেরে নাও। হ্যাঁ, বাঘটার সন্ধান পেলে ?

বাঘের কথা তুললে প্রতাপ সব ভুলে যায়, নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত। বিক্রমের এখনও অনেক কাজ। তাই বাধা দিয়ে ওঠে—বৈকালে কথা হবে।

প্রতাপই বলে ওঠে চল না আজ শিকারে, মাচা বাঁধতে বলে এসেছি। মাচায় থাকবে, কোন ভয় নেই।

বিক্রম যেন কি ভাবছে। একটু ভেবে জবাব দেয়—দেখি কাজগুলো সারতে পারলে যাব না হয়।

প্রতাপ বের হয়ে যায়। দোতলা থেকে ডাক পাড়ে গুরুগম্ভীর স্বরে—অনা!

অনুকূল হাতের বন্দুক ফেলে রেখে বের হয়ে আসে—হুজুর!

আবার বাড়িতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসে। দারোয়ান চাকরবাকর কাছারির আমলা ফৈলারাও জানতে পারে আজ রাত্রে বাবুর শিকারে যাবার সংবাদ।

বাবুর্চিখানাতেও সাড়া পড়ে যায়, ছোটবাবুর জন্য এ বাড়িতে খানার বিশেষ ব্যবস্থা; বিক্রমনারায়ণের খাদ্যবস্তুর দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ওই সব অখাদ্য-কুখাদ্যগুলো তার চলে না বিশেষ করে বেজাতের হাতে। প্রতাপনারায়ণের দৃষ্টি আরও প্রসারিত। সে খাদ্যবস্তুর সম্বন্ধে উদারমতাবলম্বী, আর বাবুর্চি ছকু শেখও বাবুর রুচিমত খাবার বানাতে পারে। মুর্গি মটন-এর অনেক পদ।

অনুকূল বাবুর্চিকে বলে ওঠে—

—গোটা তিনেক মুরগি লাগাও শেখজী। বাবু হুকুম করেছেন গলা খাটো করে বলে এদিক ওদিক চেয়ে—আমার আর্জিটাও ভুলো না সাহেব।

অনুকূল অবশ্য ভাগ পায় বাবুর টিফিন কেরিয়ার থেকে—তবে ফাউ চাইতে দোষ কি গোছের ভাবখানা। ছকু শেখ বলে ওঠে—তুমি নেমকহারাম আছো অনা।

অনা প্রতিবাদ করে ওঠে—কোন্ শালা বলে! তোমাকে সেদিন ভাগ দিইনি? আস্ত একটা মোরগ—ধরো প্রায় তিনপো মাংস—

হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে চুপ করে গেল অনুকূল ছকু দুজনেই। এ বিষয়ে দুজনেই একটা অদৃশ্য সন্ধিপত্রে সই-সাবুদ করে রেখেছে।

—কিগো দাদাবাবু।

অনুকূলই বের হয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায় দাদাবাবুকে। প্রতাপনারায়ণের ছেলে প্রদীপনারায়ণ; এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে—পাস করে শহরে যাবে পড়তে। সতেজ শালগাছের মত চেহারা—যেন প্রথম বর্ষার জল-পাওয়া শালগাছ—লকলকে নধর একটা সজীব তারুণ্য ওর সারা দেহমনে।

এগিয়ে আসে প্রদীপ—আমাকে নিয়ে যাবে আজ?

অনুকূল দাদাবাবুর দিকে চেয়ে থাকে; বাবার মতই দশাসই জোয়ান হয়ে উঠবে কালে। তেমনি স্থির ওর চোখের দৃষ্টি, চোখের তারায় বনের বাঘের মত কয়রা একটা কটাসে আভা—মাঝে মাঝে যেন ঝলক মারছে।

প্রদীপ ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে ওঠে—

—বাবাকে বলো তুমি, নিশ্চয়ই রাজী হবেন। আমি যাবো।

বাঘ শিকার করতে যাওয়া আর দেখতে যাওয়া প্রায় সমান বিপদ, কখন কাকে ছেড়ে কাকে আক্রমণ করবে কে জানে। রক্তের স্বাদ পাওয়া উন্মাদ জানোয়ার! নিজেই ভরসা পায় না অনুকূল।

—নাই বা গেলেন আজ, পরে আমি নিজে নিয়ে যাবো।

প্রদীপের এক গোঁ—উহুঁ, আজই যাবো। রোজ কি বাঘ মারতে যাবে তোমরা?—বলো গিয়ে তুমি।

অনুকূল, বাবুকে চেনে। একটা জায়গায় বাবুর মন কতখানি নরম তা জানে। একটি মাত্র সন্তান ওই প্রদীপ—তার উপর অনেক আশা-ভরসা। তেমনি নানা দুর্বলতা। ইতিপূর্বে একদিন ওকে নিয়ে গড়ের জঙ্গলে ঢুকেছিল অনুকূল—প্রদীপও সবে বন্দুক চালাতে শিখেছে। সেই আনন্দ আর সাহসে ভর করে সারাদিন বনে ঘুরে শেষকালে মস্ত একটা দাঁতাল বনশুয়োর শিকার করে আনে।

প্রদীপের প্রথম শিকার। বলিষ্ঠ যুবক, দু-চোখে তার আনন্দের আভা।

বীরদর্পে কাছারিবাড়িতে এনে ফেলল সেটাকে। লোকজন জুটেছে অনেক, বিশেষ করে বাউরীরা, ওই শুয়োরমাংসের লোভে। না হোক অন্ততঃ মণ তিনেক মাংস তো হবেই।

প্রতাপবাবুও নেমে আসেন দোতলা থেকে। প্রদীপের হাতের প্রথম শিকার। আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে প্রদীপ,

—দেখ বাবা, নীচে দাঁড়িয়ে সামনা সামনি একগুলিতে শেষ করেছি। ক্লিন বিটুইন দি টু আইজ।

মৃত বরাটা দেখতে থাকে প্রতাপনারায়ণ, ভর জোয়ান দাঁতাল, যদি কোন কারণে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো প্রদীপকে সেদিন অক্ষত রাখতো না। অনুকূল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে যেন কাঁপছে সে ছোটবাবুর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে।

সেখানে কিছু বলে না প্রতাপনারায়ণ। উঠে যাবার সময় ডাক দেয়—একবার আসবি অনা।

এ ডাকের অর্থ বোঝে অনুকূল—সেইই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল দাদাবাবুকে। এত বড় বিপদের ঝুঁকি নেবে ওই প্রদীপ বনে গিয়েও ভাবতে পারেনি সে। যদি কোন বিপদ হতো আজ! ভাবতে শিউরে ওঠে অনুকূল।

চটির শব্দ তুলে ছোটবাবু উপরে উঠে গেল পিছু পিছু ধীরপায়ে এগিয়ে যায় অনুকূল।

ঘরে ঢুকে চোটখাওয়া বাঘের মত অতর্কিতে পিছনে ফিরে গর্জে ওঠে প্রতাপনারায়ণ,

—ফের যদি কোনদিন ওকে বনে নিয়ে গেছিস তোকেই গুলি করে মারবো আমি।

অনুকূল চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিবাদ করাও বিপদ। প্রতাপ টেবিলের উপর সিগারেট কেশ থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে উপর্যুপরি কয়েকটা জোর টান দিয়ে বলে ওঠে—

—যা। কথাটা যেন মনে থাকে।

মাত্র কয়েকমাস আগেকার ঘটনা. এত শীঘ্র ভোলেনি অনা। ছোটবাবুকে যমের মত ভয় করে। তাই অনুকূল হাতজোড় করে শুধু জবাব দেয়—

—বাবুকে বল্‌গে দাদাবাবু, আমি পারবো না।

প্রদীপ যেন কথাটা মেনে নিতে পারে না। বাবাকে বলেও কোন ফল হবে না। লোহার মত কঠিন ধাতের মানুষ ওই প্রতাপ-নারায়ণ, একবার যে হুকুম দেবে তার আর নড়চড় হবে না কোনদিনও।

চুপ করে কি ভাবতে ভাবতে সরে গেল প্রদীপ হতাশমনে।

বিক্রমনারায়ণ শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছে হেতে। বৈকালের আলো মুছে যাবার আগেই তারা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলমহালের দিকে এগিয়ে চলে। গ্রীষ্মের বৈকাল—সারাদিন রোদে পুড়ে কর্কশ বিবর্ণ তাম্রাভ মাটি যেন অগ্নিকুণ্ডের মত আছে। হাওয়া ছোটে—তখন গরম ছ্যাঁকা লাগায় সারাদেহে। ক্রমশঃ ডাঙা ছাড়িয়ে বনে ঢুকেছে তারা, অল্প স্বল্প আঁটাড়ি—ছোট দু-তিনসনি শাল ঝোপে ছাওয়া বনভূমি—একটু গিয়েই তারা গভীর বনের মধ্যে ঢোকে। নির্জন অরণ্যানীতে ওঠে মানুষের পায়ের শব্দ, মহুয়া গাছের ডালে একটা ময়ূর উঠে বসে আছে—নীচেকার ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসে আছে কয়েকটা ময়ূরী, ডানাপালকের বাহার নেই ন্যাড়া, বোঁচা,—ওদের দেখে উড়ে গেল বনের গভীরে; কোথাও সড় সড় শব্দ তুলে ছুটে যায় একজোড়া খরগোশ।

বড় জানোয়ার শিকার করতে বের হয়ে ছোটখাটোর দিকে নজর দেওয়া কাজের নয় দেখেই অনুকূল লোভ সামলায়, নইলে ছক্কু বাবুর্চিকে দিয়ে আজই খরগোশের মাংস রাঁধাতো—তোফা মাংস।

দামোদরের ধার থেকে শুরু করে অজয় নদের কিনারা পর্যন্ত

নেতাড়ে জঙ্গল; শাল মহুয়া কেদ মুরগা গাছের সমারোহ; রাঢ়ের অন্যতম বৃহৎ জঙ্গল।

মাঝে মাঝে বনের ঢলগড়ানি খুল—গভীর খাদ। ক্রমশঃ নীচু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। ওর মধ্যে বাঘ সেঁধিয়ে থাকলে বাঘ পাওয়া মুশকিল—বনবরা, ভালুকও না থাকা নয়। শাহী-সড়ক বাঁহাতি রেখে তারা এগিয়ে চলেছে—মাথার উপর একফালি আকাশের আঁচলা ক্রমশঃ মুছে আসছে—লাল থেকে ফিকে লাল, ক্ষীণাভ হয়ে আসে দিনের আলো। আশপাশের অশথ মহুয়া গাছের ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে পাখপাখালি, তাদের কিচমিচ শব্দে বনভূমি মুখর হয়ে ওঠে—বাতাসে কুর্চিফুলের উদগ্র সৌরভ।

অনাই তাগাদা দেয়—একটু পা চালিয়ে চলুন হুজুর, পথেই সন্ধ্যে লাগবে মনে মনে হয়।

বিক্রমনারায়ণ মনে মনে ভয় পায়, সে কাছারিবাড়িতেই থাকবে জঙ্গলমহালে—ওরা সেখান থেকে যাবে নদীর ধারে 'ঝিল'টার কাছে।

—জঙ্গল কাছারি আর কতদূর রে?

অনা চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে অন্যমনস্কের মত বলে ওঠে—আর দেরি নাই হুজুর!

মাছি উড়ছে—দু-একটা ডাঁশ। কেমন গিনি গিনি শব্দ। অনা নাক দিয়ে কি যেন শুঁকছে বাতাসে। প্রতাপনারায়ণ চলেছে আগে আগে। পিছনেই কাছারির দারোয়ান চৈত সিং পালোয়ান—হাতে সাতগিঁঠের প্রকাণ্ড একটা লাঠি। ওই লাঠি দিয়েই নাকি সে যমরাজাকেই পিটে ছাতু বানাতে পারে—তা বাঘ হুড়ার তো কোন্ ছার। দর্পভরে বনের বালি মাটি কাঁপিয়ে চলেছে সে, তার পিছনেই বিক্রমনারায়ণ, সবার পিছনে বন্দুকহাতে অনুকূল, তার আগে আগে অনুকূলের শাগরেদ ভোলা মাঝি প্রতাপনারায়ণের রাইফেল কাঁধে ফেলে চলেছে।

কেমন যেন একটা খস খস শব্দ, গাছে পাতায় গা ঘষার শব্দ। সব পাখপাখালির চীৎকারও যেন বেড়ে ওঠে বনের মধ্যে। বাতাসে কেমন একটা চাপা গন্ধ।

বার বার শুঁকেও কোন সন্ধান পায় না অনা, কে জানে রক্তমুখী বাঘ, এমনিই অতি শয়তান জীব। বাতাসের গতিবেগের দিকে লক্ষ্য রেখে ঘুরপাক দিয়ে চলে—যেন বাতাসের সঙ্গে ওদের দিকে কোন গন্ধই ভেসে না আসে।

বনের শুকনো পাতায় কোন শব্দটুকুও যেন না ওঠে—তাই সন্তর্পণী তার প্রতিটি পদক্ষেপ। হলুদ শালপাতার আড়ালে কি যেন নড়ছে।

—হুজুর!

অনা কিছু বলবার আগেই প্রতাপনারায়ণ চমকে উঠেছে! পাতার ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে এসে দু'পা ভেঙে, বসেছে প্রকাণ্ড বাঘটা—নাগেশ্বরী চিতা। স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে ল্যাজ নাড়ছে পরম নির্বিকার নিরাসক্তের মত।

কোন্‌দিকে কি হয়ে যায় বুঝতে পারে না, অনার চীৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পালোয়ান চৈত সিং যমতাড়ানো লাঠির মালিকানা পরিত্যাগ করে উধাও হয়েছে—সেই সঙ্গে বিক্রমনারায়ণও। মালিক আর চাকর একনিমেষই ফৌৎ; সেই সঙ্গে রাইফেল কাঁধে ভোলা মাঝিও হাওয়া; কি করে এইটুকু সময়ের মধ্যে কাণ্ডটা নির্বিবাদে ঘটে গেল বোঝা যায় না; অনাকে পালাবার সময় ওরা ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়েছে পাশের গভীর বনের জলগড়ানি খাদের মধ্যে একটা ঘন সরঝোপের বুকে,—ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়ে কোন্‌দিকে তার বন্দুক। অনাও কিছু ঠাওর করতে পারে না।

প্রতাপনারায়ণ থমকে দাঁড়িয়েছে বাঘের মুখোমুখি। সামনে ওই সাক্ষাৎ শমন—বিকৃত বীভৎস মুখ দিয়ে লালা ঝরছে; ভন ভন করে উড়ছে মাছি ওর চারপাশে; যে কোন মুহূর্তে প্রতাপের সামান্য

একটু নড়াচড়াতেই ওই মৃত্যু-দানব লাফ দিয়ে এসে পড়বে তার ঘাড়ে। বিরাট ওজনে ধরাশায়ী করবে তাকে। তারপর।

পেছনে কেউ নেই। ভোলা মাঝির বয়ে আনা রাইফেলটা পড়ে আছে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত দূরে। স্থিরদৃষ্টিতে বাঘের কপিশ পিঙ্গল জ্বালাময় হিংস্র চোখের দিকে চেয়ে প্রতাপনারায়ণ; দৃষ্টি সরালেই ও লাফ দেবে।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ। বনভূমি কেঁপে ওঠে। বাঘটা সেই থাবা ভেঙ্গে বসে থাকা অবস্থার থর থর করে কেঁপে ওঠে; তারপরই নিস্তব্ধ হয়ে যায়, দুই থাবার উপর লুটিয়ে ওর মাথাটা; কপাল থেকে—মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে খানিকটা তাজা রক্ত।

পিছন ফিরেই ওকে দেখে প্রতাপনারায়ণ অবাক হয়ে যায়।—তুমি? তুমি এখানে?

প্রদীপ দাঁড়িয়ে আছে—হাতে প্রতাপনারায়ণের পুরানো একটা পয়েন্ট ফোর-ফোর হেভি রাইফেল।

অনাও সরঝোপ থেকে উঠে এসেছে ক্ষতবিক্ষত হয়ে; প্রতাপ-নারায়ণ কোন কথা বলেন না। মৃত বাঘটার দিকে চেয়ে দেখে বলে ওঠেন প্রদীপকে—

—তুমিই মারলে শেষ পর্যন্ত। ইওর গেম।

অনুকূল কেমন যেন ঘাবড়ে যায়—ওরা ঠেলে ফেলে পালালো হুজুর, ওই চৈত সিং আর বড় হুজুর।

যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে অনুকূল ডোম।

প্রতাপনারায়ণ তাকে ইশারা করে থামিয়ে বলে ওঠেন—

—ওটা আনাবার ব্যবস্থা কর, ভালো চামড়াটা।

কিছু না বলে ফিরলো প্রতাপ; অনা বলে ওঠে—

—ওখানে যাবেন না হুজুর, মাচা বাঁধা হয়ে গেছে?

—যাবার আর দরকার নেই অনা।

আর দাঁড়ালো না প্রতাপনারায়ণ, নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা

আসে, দুর্বার লজ্জা। একটা দুধের ছেলে আজ তাকে যেন মস্ত একটা শিক্ষা দিয়েছে, এতবড় শিকারী বনে ঢুকে সাধারণ নিয়মটুকুও মানেনি—নিজের হাতিয়ার রেখেছে পরের জিম্মায়।

নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা আসে—দুস্তর লজ্জা। আজ প্রদীপই তাকে বাঁচিয়েছে নিপুণ হাতের একটি মাত্র গুলিতে; ব্যর্থ হলে আজ আর তাকে ফিরে যেতে হতো না বাড়ি। আগেকার সেই মৃত বনশুয়োরটার কথা মনে পড়ে—এমনি স্থির নিপুণ শিকারীর মতই দক্ষতা ছিল, একটি মাত্র গুলিতেই সেও পড়েছিল।

যে প্রদীপকে কোনদিনই প্রতাপ টানতে চায়নি প্রাণঘাতী এই নৃশংস খেলায় সেই প্রদীপই আজ অযাচিতভাবে তার নিষেধ অগ্রাহ্য করে এসেছিল তাকেই বাঁচাতে।

—বাবা।

পথ চলতে চলতে লক্ষ্য করেছে প্রদীপ বাবার এই পরিবর্তন, কি যেন গভীরভাবে ভাবছেন তিনি। তার মত শিকারী ইতিপূর্বে এমনি বিপদের সামনে পড়েছে। সেবার মামড়ার জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়েছিল, প্রাণঘাতী সেই লড়াই-এ আহত ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল প্রতাপনারায়ণই। বাঘটা তাকে ছেড়ে দিয়ে পালায়, প্রতাপনারায়ণের জ্ঞানহীন দেহটাকে ওরা তুলে নিয়ে যায়—পরদিন সকালে বনের মধ্যে পাওয়া যায় মৃত বাঘটাকে, তার চোয়াল দু-ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়েছিল।

আজ যেন অন্য কোথায় আঘাত পেয়েছে প্রতাপনারায়ণ। প্রদীপের ডাকে মুখ তুলে চাইল, কথা বলে না।

পিছনে আসছে অনুকূল—তার পিছনে বাঁশে বেঁধে কয়েকজন মরদ প্রাণহীন বাঘটাকে বয়ে আনছে।

প্রদীপও বাবাকে আর কিছু বলে না, বলতে যেন ঠিক সাহসে কুলোয় না তার।

গ্রামে ঢোকবার সময় বেশ রাত্রি হয়ে যায়—রাতের অন্ধকারে

মুখ ঢেকে যেন প্রতাপনারায়ণ বাড়ি ফিরলো। কোন কথা না বলে উপরে উঠে গেল নিজের মহালে।

বিক্রমনারায়ণ সেদিন বনমহালে যেতে রাজী হয়েছিল ঠিক শিকার করা দেখতে নয়, বিশেষ কাজে। প্রতাপ আজ যে বন-বিক্রির গুজব শুনেছে সেটা নিছক মিথ্যা নয়। তবু চাপা দেবার চেষ্টা করতে হবে। নায়েব গোমস্তাকে সামলানো দরকার। জানোয়ারের উৎপাত বেড়েছে—একা বা লাঠিধারী পাইক পেয়াদা নিয়ে যেতে ভরসা হয় না, ওরা বন্দুক রাইফেল নিয়ে চলেছে সেই ভরসাতেই চলেছিল বড়বাবু। ওরা শিকার করতে বের হবে বলে এই অবসরে বিক্রম নায়েব-গোমস্তাকে কথাটা প্রকাশ করতে নিষেধ করবে। কাগজপত্র সামাল দেবে ; কিন্তু পথের মধ্যে এমনি অঘটন ঘটে যাবে কল্পনা করতে পারেনি। সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে দেখা হবে পথের মধ্যেই এ তার স্বপ্নের অগোচর ছিল বুক কাঁপছে অজানা ভয়ে।

কিন্তু শীর্ণ পা দু-খানায় এত শক্তি লুকোনো ছিল ভাবতে গিয়ে নিজেই চমকে ওঠে। একেবারে বনবাদাড় খুল-খন্দ ভেদ করে সোজা কাছারিবাড়িতে পৌঁছে যাবে ভাবতেই পারেনি বিক্রমনারায়ণ।

বড় হুজুরকে তেমনি মুক্তকচ্ছ অবস্থায় দেখে নায়েব ফৈলারা ধড়মড়িয়ে ওঠে।

—হুজুর!

আর হুজুর! হুজুরের তখন জলটান ধরেছে। ভয়ে বাক বন্ধ হবার উপক্রম। ইশারা করে দেখায়—জল।

ঘটিখানেক জল কোঁক কোঁক শব্দে গিলে—খানিকটা মাথায় মুখে দিয়ে বসে পড়ে কাছারিঘরের মেজেতেই। বেশ খানিকটা চেষ্টা করে বলে মাত্র দুটি কথা—বাঘ।

—কোথায়?

—কোন্‌খানে ?

ওদের সমবেত প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থা তার নেই, আঙুল দিয়ে পাগড়ি-খুলে-পড়া পালোয়ানজীকে দেখায়। পালোয়ানজীর চোখদুটো তখন কপালে উঠেছে। মাথার লম্বা টিকি ফর ফর করে উড়ছে হাওয়ায়—এতক্ষণ তেমনি উড়ে এসে এখনও ফিরেন পায়নি। পালোয়ানজী বে-হাতিয়ার বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়েছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ওঠে।

—টাট্টিখানা কিধার ? জলদি !

বাঘ যেন টাট্টিখানাতেই ঢুকেছে কাছারির। এমন সময় একটা গুলির শব্দ শুনে সচকিত হয় তারা। তার পরেই বনের ভিতর অনুকূল ডোমের চীৎকার কানে আসে। বের হয়ে পড়ে তারা বনের দিকে লাঠি সড়কি নিয়ে।

বিক্রমনারায়ণের সামলাতে সময় লাগে—সেই রাত্রে থেকেই গেল সে কাছারিতে। ফিরোনা দরকার। যেন ঝড় বয়ে গেছে দেহ-মনে।

সে বেনামীতে জঙ্গলমহালের বেশ কিছু অংশ কিনেছিল লাটের নীলামে, এতকাল এস্টেটের মধ্যেই ছিল। বিক্রমনারায়ণ সেই অংশটা বিক্রিই করেছে প্রতাপকে না জানিয়ে। জানে নায়েব। তাকে এ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া দরকার। যা হয়ে গেছে তা যেন সহজে প্রকাশ না পায়।

নায়েব কথাগুলো শুনে চুপ করে। বড় হুজুরের মনের কালোছবিটা ওর সামনে প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে। বলে—একদিন তো এ খবর প্রকাশ পাবেই ! বিক্রির খবর তো চাপা থাকবে না। সেদিন ?

বিক্রমও ভেবে রেখেছে কথাটা। পরের কথা পরে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তো চাপা থাক। বলে ওঠে বিক্রম।

—তা পাবে। তবে সেদিন আমি সামলে নিতে পারবো।

—আমি কি জবাব দোব? জানেন তো তাঁকে! গোমস্তা নায়েবরাও প্রতাপকে ভয় করে, প্রাণের ভয়।

বিক্রমনারায়ণ চতুর লোক, নায়েবের এই ভয় করার কারণটা কি কিছুটা অনুমান করতে পেরে একটু হেসে জবাব দেয়—

—সে না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। একা সব আমি খাব না। তোমরা পাঁচজন আছো।

নায়েব হাতজোড় করে গরুড়পক্ষীর মত বিনয়ে গদগদ হয়ে জবাব দেয়—

—আজ্ঞে আপনিই তো মা বাপ, খাচ্ছি পরছি আপনারই।

একটু আগে প্রাণভয়ে দৌড়ে আসা মানুষ এই বিক্রমনারায়ণ নয়; এরই মুখ-চোখে অরণ্যের আদিম প্রাণীর লালসা। কপিশ চোখ দুটো জ্বলছে। উদ্দাম অর্থলোলুপ একটি জীব।

বাইরে তারাজ্বলা অন্ধকার রাত্রি, বিক্রম তখনও রোকড় জমাপড়চা সালতামামী কাগজপত্র ঘেঁটে চলেছে। যেন গহন অরণ্যে শিকারের সন্ধানে ঘুরছে একটি রক্তলোভী হিংস্র বাঘ। নায়েব চুপ করে বসে আছে, শুধু যেন দেখছে ওর গতিবিধি।

বিক্রমনারায়ণ সেবার সুযোগ হাতছাড়া করেছিল আর তা করতে রাজী নয়, সুযোগ বার বার আসে না। এ সম্বন্ধে কালীপুরের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত নটবর মুখুয্যেও পরামর্শ দেয়—

—যে রকম হাওয়া বদলাচ্ছে তাতে দাপটে জমিদারি করা আর যাবে না বড়বাবু, এখন প্রজাপাটককে কাছারিতে ধরে নিয়ে যান শাসন করতে—দল বেঁধে ওরা হামলা করবে। দু-চার ঘা দেন—ফাঁক পেলেই নালিশ দায়ের করবে।

বিক্রমনারায়ণ নটবরের কথাগুলো শুনছে একমনে। নটবর মুখুয্যে কালীপুরের মুকুটহীন সম্রাট, একাদিক্রমে পনেরো বছর

প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতি করে চলেছে। জঙ্গলের ধারে ছোট্ট স্টেশন—মেন লাইনের গাড়ি, মালগাড়িগুলো কালীপুর ছেড়েই ওই গভীর জঙ্গলে ঢোকে; সেই সময় অনেক কিছুই মালপত্র পাচার হয় সেই বনের মধ্যে চলন্ত গাড়ি থেকে; দুষ্ট লোকে বলে নটবর নাকি তাদের সহযোগী—তবে সহযোগী হোক আর না-হোক নটবর বেশ গুছিয়ে নিয়ে বিনা মূলধনেই দাপটে বাস করছে কালীপুরে—বেশ মানী লোক বলা যায়, বেশ নানারকম গুণ থাকা সত্ত্বেও। তারও দাপটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা চলেছে, কালীপুর বাজারে দু-চারজন ব্যবসাদার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বিশেষ করে নতুন স্কুল হবার পর থেকে দু-চারজন বাইরের মাস্টার আসায় বেশ খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়ছে নটবর।

বিক্রমনারায়ণের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়, পাশাপাশি গ্রাম। বাল্যবন্ধুও বলা যায় দু-জনকে। নটবরই পরামর্শ দেয়—এই বেলা হাত আছে, মান-খাতির থাকতে-থাকতে কিছু ব্যবসাপত্রে নেমে পড়ুন। চাই পয়সা, কেবল পয়সা দিয়েই সব কেনা যাবে। জমিদারির অবস্থা তো টলোমলো, দেখুন না নারায়ণপুর—ভিরখণ্ডী—নাচনের জমিদারদের অবস্থা। দেনার দায়ে লাটের কিস্তি যোগানো দায়। হাতীর খরচই জোটে না—খাজনা দিয়ে জমিদারি রক্ষা করবে কি।

কথাটা মনে ধরে বিক্রমনারায়ণের, সবই শুনেছে। রায়বাবুরা রানীগঞ্জের কোন মাড়োয়ারীর গদিতে খত লিখিয়েছে। চৌধুরীবাবুদের ভিতরের হালও অমনি। দেনদার হয়ে পড়েছে।

—জঙ্গলমহালে কিছু বিচে দেব, হাতে খদ্দের আছে?

নটবর মুখুয্যে যেন এই সুযোগের সন্ধান করছিল। রানীগঞ্জের কিষণচাঁদ ভালোটিয়া তো হাত বাড়িয়ে বসে আছে—কথাটা জানিয়ে দিলেই বিপদ; সোজা কথাবার্তা চললে ফাঁক থেকে দালালি সেই সঙ্গে কালীপুর স্টেশনের আশেপাশের কিছু জমি মুফত পাবার আশা নির্মূল হয়ে যাবে। তাই হুঁকোটা টানতে টানতে নটবর পরম

নিরাসক্তের মত জবাব দেয়—অনেক টাকার ব্যাপার, দেশে এত পয়সা আছে কার? দেখি খোঁজ-খবর করে আপনি যখন বলছেন—

বিক্রমনারায়ণ এদিক-ওদিক চেয়ে একটু সুর নামিয়ে বলে—

—দেখো মুখুয্যে, কথাটা যেন পাঁচকান না হয়। একটা ঢাকভাগের ব্যাপার।

হাসে নটবর; এর চেয়ে অনেক নিগূঢ় ব্যাপারই ঘটে নটবরের আড্ডাতে। বিক্রমনারায়ণের সাধু ভালোমানুষ রূপটি এখানে বদলে যায়; নটবর বলে—

—কই সে-সব খবর কোনদিন বের হয়েছে যে এটা হবে! কাক-পক্ষীতে টের পাবে না এই সব বিক্রি-বাটার খবর।

লজ্জিত হয় বিক্রম—না, না তা অবশ্য হয়নি।

নটবর বুদ্ধি দেয়, এজমালি সম্পত্তি দেন যা পারেন ফাঁক ক'রে। এতো আখচারই হচ্ছে।

ঝিমঝিমে সন্ধ্যা নেমে আসছে কালীপুরের বাজারে। নামেই বাজার। এক ফালি রাস্তামাত্র গিয়ে শেষ হয়েছে ইস্টিশানের গায়ে। ওপারে খাঁ-খাঁ মাঠের প্রান্তে দামোদরের বালিয়াড়ি। এপাশে লাইনটা গিয়ে দু-দিকের গর্জের মধ্যে ঢুকেছে। চারিদিকে ঘন শালবন—হিংস্র বাঘ, বনশুয়োর আর ভালুকের রাজ্যি।

তারই মাঝখানে কালীপুরের কয়েকটি আলো টিমটিম করে জ্বলছে, একটু আঁধার ঘন হতেই তারাও একে একে নিভে যায়। ছেয়ে আসে অন্ধকার—আদিম অন্ধকারের একক সর্বগ্রাসী অখণ্ডতা।

জেগে ওঠে কালীপুরের আরণ্যক সত্তা। নটবরের বৈঠকখানা ঘরে মিটিমিটি আলো জ্বলছে। বিক্রমনারায়ণকে এখন দেখলে চেনা যায় না; পাশে নামানো কয়েকটা বিদেশী পানীয়ের বোতল; হাসছে ওদিকে একটি মেয়ে; সারা দেহমনে ওর কুৎসিত একটা ছাপ।

নটবরকে বলে ওঠে বিক্রম—নতুন কিছু আমদানি করো মুখুয্যে, নতুন মুখ।

কামিনী হাসে—কেনে আর নজরে ধরছে না বুঝি বড় হুজুরের?

বিক্রমনারায়ণ রসিকতা করে গোলাপী নেশা লাগা চোখে।

—সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী দুইই চাই কামিনী। তুই তো সুয়োরাণী—দুয়োরানী কই!

নটবর কি ভাবছে। ওদিকে করঞ্জপাড়ার ঘাটে সেদিন কাকে যেন দেখেছিল এক নজর; যেমন রূপ তেমনি যৌবন। কি ভেবে বলে ওঠে—

—কিছু টাকাকড়ি হলে হতে পারে বড় হুজুর, একটু শক্ত জায়গা—বেশী কিছু খসবে বলে মনে হয়। তবে ঠকবেন না খরচা করে।

বিক্রমনারায়ণ মাথা নাড়ে। পয়সা খরচা করতে নারাজ, যদি সুযোগ সন্ধান পায় যেমন করে হোক ধরে তুলে আনাই ভালো। অযথা খরচা করতে মন চায় না। হুঁশিয়ারী মন।

—কোথায় আছে? লোকজন পাঠিয়ে দিই তোমার কাছে।

কামিনী কান খাড়া করে যেন শুনছে ওদের কথাবার্তা। কালীপুরের বেবশ যৌবনধারা; বনের মত অজানা রহস্যময়ী, দামোদরের মত দুর্দাম বেবশ ওই কামিনী।

বিক্রমই সামলে নেয়—ওসব এখন থাক মুখুয্যে। তোমাকে যা বললাম তাই করো। জঙ্গলমহালের ব্যাপারটা খোঁজ নাও।

মদের নেশাতেও আসল কথা ভোলে না বিক্রমনারায়ণ। ওটা ধাতস্থ হয়ে গেছে।

বাঘ মারতে বের হয়ে প্রদীপ সেদিন ওই সময় গুলি না করে পারে নি। নিপুণ হাতের একটি গুলিতেই বাঘ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে কি যেন একটা শঙ্কা জেগেছে সেই থেকেই।

প্রদীপ সেই দিনের পর থেকে বাবাকে কেমন এড়িয়ে চলে। প্রতাপনারায়ণ এমনিতে অত্যন্ত রাশভারি লোক। কথাবার্তা বলে কম। হঠাৎ সেই গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি যেন আরও বদলে যায়। স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্তনটা সীতারও নজরে পড়ে।

সেদিন দুপুরে খাবার পর ঘরে বসে কাগজ পড়ছে প্রতাপ-নারায়ণ; বিছানায় নামানো কয়েকখানা শিকারের ইংরাজী বই। জিম করবেটের ম্যানইটার্স অব কুমায়ুন বইখানা পড়তে পড়তে ফেলে রেখেছে—কেমন যেন ভাল লাগে না আর ওসব। স্ত্রীকে একটা রুপোর ডিবেয় মুখশুদ্ধি নিয়ে ঢুকতে দেখে কাগজখানা রেখে ওর দিকে চাইল।

সীতা এগিয়ে আসে, নিস্তব্ধ ঘরখানা। জানলার ফাঁক দিয়ে দূরে জি. টি. রোডের দু-ধারে ঘন গাছ-গাছালির মাথা দেখা যায়—তার সীমাপারেই মামড়ার ঘন সবুজ শালবনসীমা কাছিমের পিঠের মত উঠে গেছে।

—তোমার কি হয়েছে ক-দিন? চুপচাপ রয়েছো!

মুখশুদ্ধির ডিবে থেকে দু-টুকরো সুপারী আর দারচিনি তুলে নিয়ে মুখে ফেলে জবাব দেয় প্রতাপ সহজভাবেই—

—কই, কি হবে?

সীতা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। হাসছে প্রতাপ, সীতার অসহায় চাহনিতে যেন আনন্দ পায় সে।

—পাগল কোথাকার!

সীতা স্বামীর ওই সহজ সুন্দর রূপটিকে বার বার দেখেছে—প্রথম যখন এ বাড়িতে বউ হয়ে আসে কত না ভয় করেছিল, এই এলাকারই দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। অত্যন্ত দরিদ্র তার বাবা। এ অঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দেশপূজ্য শুধু ওইটুকুই। দু-বেলা কোনরকমে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করতেন তিনি। কারোও কোন দান গ্রহণ করেননি—কর্তামশাই

বহুবার চেষ্টা করেও পারেননি দরিদ্র ব্রাহ্মণের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাতে। বহুবার বহুভাবে তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। অন্ততঃ দু-বেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান করে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর। প্রতিবারই কোন না-কোন ছুতোনাতায় তাঁর সেই দান ব্রহ্মোত্তর জমির পত্তনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সেদিন আর ফেরাতে পারেননি তিনি কর্তামশাইকে। কর্তামশাই ওঁর মেয়েকে দেখেছেন ইতিমধ্যে মহালে এসে। সর্বসুলক্ষণা রূপবতী কন্যা। মনে মনে সব ব্যবস্থা করেই কথাটা পাড়েন তিনি।

—আপনার মেয়েকে আমার ঘরে নিয়ে যেতে চাই পণ্ডিতমশাই। প্রতাপকে আপনার পছন্দ হয়?

সীতাও কথাটা শুনে চমকে ওঠে। এ অঞ্চলের সুপরিচিত ওই প্রতাপ। বাঘমারা ছোটবাবু। বাঘের সঙ্গে শুধুহাতে লড়াই করেছে কয়েকবার। দূর থেকে দেখেছেও তাকে ঘোড়ায় করে যেতে।

তাকে বিয়ে করতে হবে। ভাবতেই কেমন একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল সারা মন। বাবার কাছে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়েছে—কাব্য অলংকারশাস্ত্র যৎসামান্য। এই মাত্র পুঁজি নিয়ে দুর্মদ একটি মানুষকে পোষমানানো—অসম্ভব। তাছাড়া জমিদারের ঘর, ওদের সম্বন্ধে অনেক গল্পকথাই মুখে মুখে রটে আছে। ওদের চরিত্র যেন রহস্যাবৃত—গতিবিধিও।

বাবাও অমত করেনি। দুরুদুরু বুকে সীতা এসেছিল।

কিন্তু এবাড়িতে এসে খুশীই হয়েছিল সীতা। প্রতাপকে দূর থেকে যা দেখেছিল কাছে এসে আবিষ্কার করে তার প্রকৃত স্বরূপ—যেটার সঙ্গে ভিতর বাইরের মিল নেই। শিশুর মত সহজ সরল অভিমানী একটি মন। জমিদার ঘরের সহজাত বদনেশার কোন সন্ধান এতদিনেও পায়নি সে। একটিমাত্র নেশা ছাড়াবার জন্য

বহুবার বহু চেষ্টা করেছে সীতা—ওই শিকারের নেশা। কিন্তু পারেনি। হার মেনেছে ওই একটি জায়গাতে স্বামীর কাছে।

মাঝে মাঝে প্রতাপের মনে যেন ঝড় ওঠে মাতনের বেগে। তার প্রতিবাদও বড় নিষ্ঠুর, সহ্যগুণ অপরিসীম। কিন্তু সহ্যের সেই সীমা অতিক্রম করলে তখন প্রতাপ আর যেন মানুষ থাকে না। অমানুষ হয়ে ওঠে, নির্মম নিষ্ঠুর একটি দানবে পরিণত হয়।

ওর মধ্যে জন্ম নেয় কোন স্বতন্ত্র মানুষ। ভিন্নসত্ত্বা। মানুষের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ফুটে ওঠে।

তাই হয়তো দাঙ্গা-ফৌজদারী-খুন-খারাবি করে বসে, না হয় বনের গহনে চলে গিয়ে সেই শ্বাপদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে বুনোবাঘ—দাঁতাল শুয়োর—না হয় হিংস্র ভালুক শিকার করে। উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বনের সেই শান্ত নিথর রূপ—আঁধার রাত্রির মিলনরঙ্গ তাকে যেন এমনি করে বার বার ডাক দেয়। সীতা সেই দুর্বার মানুষটির কাছে বার বার পরাজিত হয়েছে।

আজ সেই প্রতাপ যেন কোথায় ঘা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সীতা স্বামীর কাছে এগিয়ে আসে। স্তব্ধ স্থির দৃষ্টিতে প্রতাপ চেয়ে আছে জানলার ওই দূর সবুজ দিগন্তসীমার গায়ে অযত্নবর্ধিত শালবনের দিকে—কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তার উধাও মন। সীতার কথায় ফিরে চাইল, সীতা বলে চলেছে মৃদুস্বরে—

—প্রদীপ বড় হয়েছে। তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা অন্যায় হবে তোমার। সেও বুঝতে শিখেছে।

চমকে ওঠে প্রতাপ। তার মনের সেই দুর্বলতাটুকু সীতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায়নি। মনে মনে আঘাত পেয়েছে প্রতাপ, বাঘ শিকারের ব্যাপারে।

ব্যাপারটাকে আজ হালকা করে দেয় প্রতাপ।

—কি যা তা বলছো।

সীতা বলে চলে প্রদীপের ভবিষ্যৎ-এর কথা।

—ও তো কলেজে পড়তে চায়। এখন থেকে এস্টেটের কাজে না লাগিয়ে ওকে পড়তে পাঠাও।

প্রতাপও যেন তাকে এখান থেকে দূরেই পাঠাতে চায়। কি ভেবে বলে ওঠে—

—হ্যাঁ, পড়বে বৈকি। স্কলারশিপ-পাওয়া ছাত্র যদি না পড়ে সেটা কি ভালো দেখায়। জেলার লোক যে আমাদেরই দোষ দেবে।

হাসে সীতা—বড়ঠাকুর যেন কি বলছিলেন। এস্টেটের ম্যানেজারি নিয়ে। আমি কিন্তু ওতে রাজী নই। ও শহরে গিয়ে পড়বে, তুমিও মত দিও না ওঁর কথায়।

প্রতাপ স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। ছোটখাটো গড়ন সীতার, ফরসা সুন্দর রং—একরাশ কোঁকড়ানো চুল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে কপালের উপর, টানা টানা চোখ—যেন পাতায় কাজলের আভা লেগে রয়েছে।

প্রতাপ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় সীতাকে আজও যেন ঠিক চিনতে পারেনি সে। কোথাও যেন অজানা রয়ে গেছে।

শান্ত স্থির অচঞ্চল ওই সীতাকে প্রতাপ যেন বার বার দেখেও চিনতে পারে না। গরদের শাড়িখানা সামলে নিয়ে সীতা বলে ওঠে—যাই ওদিকে সব কাজকর্ম পড়ে আছে। অতিথিশালার সরকারকে দাঁড় করিয়ে এসেছি, ভাঁড়ার বুঝিয়ে দিতে হবে। বৈকালে আজ কোথাও বের হয়ো না। কি যেন একটা মহাকাজে ব্যস্ত সীতা। চারিদিকের সেই ঝামেলা সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। চলে গেল বাইরে।

—কেন? প্রতাপের কণ্ঠে প্রশ্নের সুর।

দরজার কাছ থেকে সীতা মুখ ফিরিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জবাব দেয়
—দরকার আছে।

প্রদীপ স্কলারশিপ পেয়ে পাস করেছে। বংশের প্রথম সন্তান এই সম্মানের অধিকারী হয়েছে, তারই অনুষ্ঠান চলেছে আজ বৈকালে। কুলদেবতাকে ষোড়শোপচারে ভোগরাগ দেবার পর গ্রামের বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সরকার মশাই—সদর নায়েব তদ্বির-তদারক করছে, প্রতাপ সামাজিক এই ব্যাপারগুলোতে আগে এসে দাঁড়াতে পারে না—কেমন যেন তার বাধে। বহু অযোগ্য লোককে অকারণে আপ্যায়ন করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ করা তার পোষায় না।

নটবর মুখুয্যে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এ বাড়ির সব ব্যাপারেই সে আসে—কর্তৃত্ব করে উপযাচক হয়ে। এলাকার লোকদের দেখাতে চায় তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার বহরখানাও। চারিদিকে তদারক করার নাম করে মোড়লি করে ফিরছে।

প্রতাপ ওই লোকটিকে কেমন যেন বরদাস্ত করতে পারে না। রাতের অন্ধকারে বনের বাঘের জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিকে সে চেনে—শ্রদ্ধা ভয় করে; সমকক্ষ বিবেচনা করে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে পথের ধারে ভীরু শিয়ালের মত ওর খুদে পিট পিট চোখের চাহনিকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা আর অবজ্ঞা করে সে। নটবর ওই শিয়ালের মতই; সামনে আসবে না—পিছন থেকে শুধু বাগড়াই দেবে ওরা। ওকে কেমন যেন ভালো ঠেকে না। কিন্তু নটবরই নাছোড়বান্দা। এগিয়ে এসে সেই প্রতাপকে আপ্যায়ন করে নটবরই—নমস্কার, ভাল আছেন?

প্রতাপ ঘাড় নাড়ে মাত্র, নটবর বলে চলেছে, গদগদ কণ্ঠে—

—আজ্ঞে, প্রদীপবাবু এ জেলার একটি জুয়েল। কেমন বংশের ছেলে দেখতে হবে তো? আহা বেঁচে থাক—ও নির্ঘাত ডেপুটি হবে দেখবেন।

প্রতাপের কাছে প্রশংসার সুরে কৃত্রিমতা ধরা পড়ে যায়। নির্লজ্জ লোকটার দিকে চেয়ে থাকে, বিরক্তি বোধ করে সে। গড়গড় করে কি সব বলে চলেছে সে।

নটবর প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত, তার কাছে ডেপুটিই সাক্ষাৎ ভগবান। প্রতাপ কথা বলে না, চুপ করে ওদিকে চলে গেল। উঠোনে খেতে বসেছে অনা ডোম, ভোলা মাঝি আরও দলবল পাইক-পেয়াদারা—সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল প্রতাপ। ওরা যেন প্রতাপের অকৃত্রিম সহচর। বহুবার বহু বিপদে আপদে-পাশে দাঁড়িয়েছে। ওর হুকুমে ওরা মরণের মাঝেও এগিয়ে যেতে পারে। ছোটবাবুকে দেখে ওরা খুশিই হয়। পরিবেষ্টাদের হুকুম করে প্রতাপ।

—ওরে মাছ আন। অনুকূল, কুনো ও গদাই,

অনা ডোম একমনে খেয়ে চলেছে, ছোট বাবুকে দেখে এঁটো হাত তুলেই গড় করে—আজ্ঞে বেদম খাচ্ছি। এন্তার খাওয়া।

হাসছে প্রতাপ ওর কথায়।

বিক্রমকে নটবর কি যেন কানে কানে বলে দোতলার বারান্দায়। বিক্রম ওর কথা শুনেই নেমে আসে। দাদাকে দেখে এগিয়ে এল প্রতাপ—কিছু বলবে?

বিক্রম বলে চলে—দোতলায় ব্রাহ্মণরা বসেছেন। তুমি একবার গিয়ে দেখাশোনা করো। যাওয়া কর্তব্য সেখানে?

—আপনিই তো আছেন সেখানে?

প্রতাপের কথায় তবু বিক্রম না বলে পারে না—

—প্রদীপের বাবা হয়ে আজ ওখানে যাবে না? তাঁরা কি ভাববেন!

প্রতাপ চুপ করে কি ভেবে বাধ্য হয়ে মত দেয়—

—চলুন তবে! যেন অনিচ্ছায় উপরোধে ঢেঁকি গিলতে যাচ্ছে প্রতাপ বিক্রমের সঙ্গে।

দেউড়িতে সানাই বাজছে। কোন আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি কোথাও বিক্রম। তার ছেলেরা কেউ এই সম্মান পায়নি। টেনেটুনে পাস করেছে ছোট ছেলে—বড় ছেলে বসন্তনারায়ণ তো এখনও স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারেনি। এইবার তার বিয়ে দেবার কথা ভাবছে বিক্রম। প্রদীপ স্কলারসিপ পেয়ে পাস করেছে। তাদের বংশে এই প্রথম ঘটনাটা।

সন্ধ্যায় ম্লান আলোয় নহবতের সুরটা ছায়াঘন বাগানের বুকে কেমন উদাস একটা গুঞ্জন আনে। কালই চলে যাচ্ছে প্রদীপ কলকাতায় পড়তে। হঠাৎ যেন প্রতাপনারায়ণ অনুভব করে মনের একটা দিক তার আজ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রদীপের সেদিনের চেহারাখানা মনে পড়ে—সামনে দুর্দান্ত মৃত্যুর মত হলদে ডোরাকাটা সেই বাঘ স্থির হয়ে বসে ল্যাজ নাড়ছে—যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ওর উপর। নিশ্চিত ধ্বংস। ওর ধারাল থাবা আর তীক্ষ্ণ দাঁতের আঘাতে ফালা ফালা হয়ে যাবে সারা দেহ। সামনে নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখে অবাক হয়ে গেছে সে।

হঠাৎ প্রদীপের বন্দুক গর্জে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে গেল সেই মৃত্যুদূত—লুটিয়ে পড়ে তাজা বাঘটা রক্ত ধারার মাঝে।

প্রদীপের দিকে চেয়ে থাকে প্রতাপ। স্তব্ধ বনানীর মাঝে শান্তি নেমেছে। অখণ্ড প্রশান্তি। মৃত্যুর দুপাশে দুজনে দাঁড়িয়ে। প্রতাপ আর প্রদীপ।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, টকটকে ফরসা রং—নিজেরই হারানো যৌবন যেন ফিরে এসেছে ওকে কেন্দ্র করে। নতুন জন্ম নিয়েছে প্রতাপনারায়ণ ওই নতুন তরুণ সত্তাকে কেন্দ্র করে। মাঝে মাঝে সেই স্মৃতিটা কেমন সব কিছুকেই ঢেকে ফেলে। বারবার মনে পড়ে সেই দৃশ্যটা।

হঠাৎ দেউড়িতে চৌঘুড়ি গাড়িখানা থামতে দেখে একটু অবাক হয়। তেজী ঘোড়া দুটো দাপাচ্ছে শানবাঁধানো পথে। বিক্রমনারায়ণ

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায়—পিছু পিছু চলেছে নটবর মুখুয্যে—যেন বাঘের পিছনে ফেউ লেগেছে।

প্রতাপও উপর থেকে দেখে গাড়ি থেকে নামছে রানীগঞ্জের ভালোটিয়াজী। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভালোটিয়া এ অঞ্চলের শেঠ হয়ে উঠেছে। প্রতাপ বলে শের। তাকে আজ এই প্রসঙ্গে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করার হেতু খুঁজে পায় না প্রতাপ।

বিক্রমনারায়ণ আর নটবর সুযোগ সন্ধানী লোক। সামান্য ছুতোনাতায় শেঠজীকে তোয়াজ করতে চায়, অবশ্য তার একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে প্রতাপ তা জানবার দরকার বোধ করে না।

বিক্রমনারায়ণ মহাসমাদরে তাকে এনে বৈঠকখানার সাজানো কার্পেটপাতা ফরাশে বসালো—নটবর কোথা থেকে একটা আতরদান এনে খানিকটা দামী কনৌজী আতর ওর গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদন করতে চায়।

—সরবৎ হুজৌর। ঠাণ্ডা।

ভালোটিয়াজী একমনে বৈঠকখানার আসবাবপত্রের দিকে চোখ বুলিয়ে চলেছে। পঙ্কের কাজকরা দেওয়ালে সোনালী রংয়ের বহু দামী কারুকার্য। কয়েকখানা বড় বড় তেলরংয়ের বিদেশী ছবি—কর্তাবাবু কলকাতার কোন বিদেশী ছবিওয়ালার কাছ থেকে বহু দাম দিয়ে কিনেছেন—ওপাশে টাঙানো প্রতাপের হাজারিবাগের জঙ্গলে শিকার করা মস্ত রয়েল টাইগারের মাথাসুদ্ধ চামড়া একখানা—দেওয়ালে গাঁথা দুটো শিঙেল হরিণের সুন্দর লতাপাতামেলা শিং। আবলুশকাঠের চকচকে পালিশ-করা দরজার পাল্লাগুলো যেন কালের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে অফুরাণ বাজে খরচ।

ভালোটিয়া তাই দেখছে। হঠাৎ বলে ওঠে—ছোট সাব কাহাঁ?

নটবর আর বিক্রমের মধ্যে একটা চোখের ইশারা হয়ে যায়।

বিক্রম জানে প্রতাপের স্বরূপ। হয়তো কি বলতে কি বলে বসবে—তাছাড়া জঙ্গলমহাল বিক্রির কথা ওর কানে যায়—এখুনি এক কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসবে প্রতাপ। তাই বলে ওঠে, এড়াবার জন্যই—ওদিকে লোকজন খেতে বসেছে একটু ব্যস্ত আছে। আসবে এখুনিই।

প্রতাপ উপরে উঠছিল ঘরে ঢুকতে যাবে ওদের কথাগুলো কানে আসে। বারান্দা থেকে কথাটা শুনে সরে দাঁড়াল। কি ভেবে নীচে নেমে গেল তখুনিই। কি যেন একটা ব্যাপার ওরা গোপন করতে চাইছে তার কাছ থেকে। নটবর মুখুয্যেই তাকে এড়াতে চায়।

যাবার সময় প্রদীপকে ডেকে ভালোটিয়াজী একটা দামী কলম দিয়ে যায়; অনেক দাম তার। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ভালোটিয়া লৌকিকতাটুকু করতে ভোলে না। বিক্রমনারায়ণ খুশী হয়ে বলে ওঠে—দিল আছে লোকটার। পয়সা থাকলেই অনেকে চামার হয়ে ওঠে, এ ঠিক তা নয়।

নটবর কলমটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে—তা যা বলেছেন বড়বাবু। ব্যাটা একটা মানুষ।

হঠাৎ প্রতাপকে আসতে দেখে থেমে গেল নটবর। বিক্রমনারায়ণ কলমটা দেখায় প্রতাপকে বলে—শেঠজী দিয়ে গেল প্রদীপকে।

প্রতাপ সেটা হাতে তুলে না দেখেই বলে ওঠে—দয়া দেখিয়ে গেল?

সামলে নেয় বিক্রম—না না, তা কেন হবে।

দাঁড়াল না প্রতাপ, চলে গেল। বিক্রম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নটবর ফিসফিসিয়ে ওঠে—

—কিছু জানতে টানতে পেরেছে নাকি বড় হুজুর। আমি বরং বাড়ি যাই, রাত হয়ে গেছে—বনের পথ।

হাসে বিক্রম—না না, ভয় নেই, খাওয়াদাওয়া সেরে যাও। পাইকরা এগিয়ে দিয়ে আসবে।

নটবরের কেমন যেন ভাল লাগে না ছোটবাবুর ওই কটমটে চাহুনি আর কাটা কাটা কথাগুলো। ও সব পারে। অজানা ভয়ে বুক কাঁপে নটবরের।

প্রদীপ কলকাতা চলে যাচ্ছে পরদিনই। প্রতাপনারায়ণ নিজে ঘোড়া হাঁকিয়ে স্টেশনে এসেছে। ছোট স্টেশন—মাত্র দু-একটা প্যাসেঞ্জার দাঁড়ায়, একটু দম নিয়ে আবার যেন পথ চলতে থাকে। স্টেশন মাস্টারমশাই, তার বাবু আর কয়েকজন খালাসী কেবিন-ম্যান ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে।

ছোট স্টেশন। চারিদিকে বন আর লালমাটির টিলা একদিকে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে দামোদরে বিস্তীর্ণ বালিচরের বুকে। যাত্রীও বিশেষ নেই।

ওয়েটিংরুম বলতে আছে একখানা ঘর—কয়েকটা বেতেমোড়া চেয়ার—একটা টেবিল—কাঁচবিহীন একখানা আয়না। বাথরুম বলতে একটু সংলগ্ন ঘেরা ঘর—আর দু-একটা খালি টব, বালতিগুলো মাস্টারবাবুর বাড়িতেই কাজে লাগে। একটা টানা পাখা আছে—টানলে বাতাসে শুধু ওড়ে জমাট ধুলো—ঘর ভর্তি হয়ে যায়।

ঘরে গুমোট একটা গন্ধ। বসা যায় না। প্লাটফরম বলতে নীচু একটু ঘেরা বাঁধানো জায়গা। সেইখানেই প্রদীপের মালপত্র নামানো।

বারান্দাতেই চেয়ার পেতে দিয়েছে খালাসীরা। প্রতাপ চুপ করে বসে আছে—বনের দিক থেকে দূরে লাইনের উপর ঝিলিক করছে একফালি রোদ—সদ্যবৃষ্টিভেজা লাল মাটি থেকে ভাপ উঠছে—বাষ্পমেশা বাতাস।

প্রদীপ চলে যাচ্ছে—যেন অন্য জগতের বাসিন্দা ও। বাবার সঙ্গে সেখানে শুধু পার্থক্যটাই বড় হয়ে ওঠে, দেহ এবং মনের পার্থক্য।

ট্রেনখানা প্লাটফরমে এসে দাঁড়াতেই মালপত্র চাকররা তুলে দেয়।

স্টেশনমাস্টার গিয়ে দাঁড়িয়েছেন গার্ডের কাছে, একটু যেন সময় দেন তিনি। মানী লোক, ফার্স্টক্লাসের যাত্রী, পান থেকে চুন খসলেই বিপদ, বিশেষ করে প্রতাপবাবুর মত মানুষের সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার করে তারা।

প্রতাপবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রদীপ বাবাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠলো।

দূরে বাঁকের মাথায় ইঞ্জিনের ধোঁয়া মিলিয়ে গেল—অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িখানা। আর দেখা যায় না তখনও প্রতাপ দাঁড়িয়ে আছে, কি ভাবছে।

—বাবু! ছোটহুজুর!

অনা ডোমের ডাকে প্রতাপনারায়ণের চমক ভাঙে।

—হ্যাঁ, চল।

কেমন যেন শূন্য বোধ হয় চারিদিক। দূরে দামোদরের সাদা বালিয়াড়ির উপর সূর্যের চিকচিকানি আলো—দূরে লাল পাহাড়ীস্তরের গায়ে বনসীমা—জনহীন স্টেশনটা কেমন অসীম শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে।

কালীপুর বাজারে দু-পাশে দোকানগুলো যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। দু-একটা দোকানে কেনাবেচা চলে মাত্র, নদীপার থেকে গাড়িবোঝাই ধান-চাল আসে—তাই বিক্রি করে তারা নিয়ে যায় বর্ষার জন্য রসদপত্র, বর্ষাকালে দুর্মদ নদী ক্ষেপে ওঠে, পারাপার বন্ধ। কোনরকমে ওই বিস্তীর্ণ নদী দু-তিনটে নৌকায় করে ঠাঁই ঠাঁই হাঁটু-বুকজল পার হয়ে খেয়ায় চেপে এপারে আসে তারা।

বর্ষার মুখ। আকাশে টুকরো মেঘ জমেছে শালবনের মাথায়। কেমন যেন বাতাস বয় এলোমেলো। বর্ষা নামতে দেরী নেই, দু-এক পশলা নেমেছে ইতিমধ্যে।

নদীতে পাহাড়ী ঢল নামছে; যে কোনদিন কালীপুরে ওদের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। দোকানদাররা ছোটহুজুরকে

নমস্কার করে হাট থেকে বের হয়ে আসে। দু-পাশের দোকান ক-খানা পার হলেই কালীপুরের সীমানাও শেষ। ওপাশে কেমার কোম্পানির চিনামাটির খাদ—বনের ধারে কয়েকখানা টালির শেড, ছোট একটা চিমনি থেকে মাঝে মাঝে ধোঁয়া ওঠে। বনের সাদা আর লাল মাটি মিশিয়ে তৈরী হয় ফায়ার ব্রিক—মাটির পোড়ানো পাইপ—টুকিটাকি। বনের অন্ধকারে ওই চিনকুঠির সামান্য অস্তিত্বটুকুও যেন হারিয়ে গেছে।

এই নিয়ে কালীপুরের সীমানা মাত্র এই ক-টি প্রাণী তার জগতের বাসিন্দা। তাদের কলরবই এখানে জাগে।

রাস্তার ধারে কাদের জটলা দেখে ঘোড়া থামাল প্রতাপনারায়ণ। খড়ের চালের একটা দোচালা ঘর; কাঠের বোর্ডে সাইনবোর্ড লটকানো—কালীপুর ইউনিয়ন বোর্ড। লেখাটা রোদে জলে ধুয়ে মুছে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটুকুতে জমেছে ক-জন লোক। কে একটি মেয়ে কাঁদছে। এককালে সুশ্রী ছিল আজ তার সারা দেহে কষ্টের কালো ছায়া। ময়লা কাপড় পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দাবড়ানি দিচ্ছে ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানী হরিসাধন চক্রবর্তী। মস্ত বিশাল চেহারা—কালো মিশমিশে রঙ। এতবড় শরীরটাকে নিরাপদে রাখবার জন্যই বোধহয় হরিসাধন ডান হাতে কালো কার দিয়ে ঢোলের মত একটা অষ্টধাতুর মাদুলি বেঁধে রেখেছে। ওর হাতে ছোট একটা জলবিহীন ডাবা হুঁকো—যত্রতত্র তামাক খাবার জন্যই হাতে হাতেই রাখে সেটা। হরিচরণ হুঁকো নেড়ে চরকিবাজীর মত ঘুরছে।

বীরবিক্রমে সে ধমকে চলেছে—ছিনেলী করবার জায়গা পাসনি ? যা না কোর্ট ঘর করগে। ইখানে কি আমড়া চুষতে এসেছিস। যা বলছি এখান থেকে।

মেয়েটিকে যেন ঠেলেই বের করে দিল আপিসের চৌহদ্দি থেকে রাস্তার উপর।

হঠাৎ লোকজন স্বয়ং ছোটবাবুকে দেখে একটু থেমে যায়, হরিসাধনও হুঁকোটা নামিয়ে ফেলে গড় করে।

—ইস্টিশানে গিইছিলেন শোনলাম।

—হ্যাঁ, ওর কি হয়েছে? মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।

হরিসাধন ইশারায় দেখিয়ে দেয়—মাথায় আঙুল দিয়ে। বলে, মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে হুজুর। ভাল ঘরের বৌ, আজ এমনি পথে পথে ঘুরছে। কপালের লেখন আর কাকে বলে। নায়কদের বৌ—লক্ষ্মীমণি। এখন অলক্ষ্মী বুঝলেন ছোটহুজুর।

সকলেই যেন কথাটা বিশ্বাস করে। প্রতাপনারায়ণও চেয়ে থাকে ওর দিকে। মেয়েটি অজানা ভয়েই দূরে সরে গেছে।

মেয়েটি দূর থেকে প্রতাপনারায়ণের দিকে চেয়ে থাকে। ঘোড়ার পিঠে চাপা বলিষ্ঠ চেহারা। কেমন সতেজ একটি মানুষ। ওর সামনে নিমেষের মধ্যে এতগুলো মারমুখী লোক যেন কেঁচো হয়ে গেছে।

বহুদিন ধরে নায়ক-বৌ বহু ভাবে চেষ্টা করেও কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য পায়নি। আজ হঠাৎ ছোটবাবুকে দেখে কি যেন ভরসা পায়।

কিন্তু এগিয়ে আসবার আগেই প্রতাপনারায়ণ ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যায় গ্রামের দিকে। উঁচু চড়াই-এর খোয়াঢালা রাস্তায় লাফিয়ে উঠেছে ঘোড়াটা—ওর খুরে-খুরে ছিটিয়ে ওঠে লাল ধুলো।

মেয়েটির কান্না থেমে গেছে—কি ভাবছে সে।

হরিসাধন হুঁকো তুলে নিয়ে আসে, বলে—গেলি! কালীপুরে ফের তোকে দেখি তবে আর বাঁচতে হবে না। কেটে কুচি কুচি করে জঙ্গলের সুঙ্গে ফেলে দিয়ে আসা করাবো। বুঝেছিস?

মেয়েটি কোন কথা বলে না। চুপ করে নির্জন পথটা ধরে

চলতে থাকে। এতদিন পর পথ পেয়েছে সে। শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

বিক্রমনারায়ণ কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। প্রজাপাটক ঠেঙ্গিয়ে নায়েব আমলা গোমস্তাদের ল্যাজ মলে দাবড়াদাবড়ি করে বৎসরান্তে কিছু ঘরে তোলার চেয়ে এই পথে রোজগার ঢের বেশী। এবং এর জন্য হাজা-শুখো অজন্মা কিছুই নেই। চললেই পয়সা। কাঁচা পয়সা আসে দিনের শেষেই।

বর্ধমান আসানসোল রানীগঞ্জ অঞ্চল নতুন করে গড়ে উঠছে। দিকে দিকে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন কলিয়ারী। মাটি তুললেই পয়সা, যাতায়াতও বেড়েছে বহু লোকজনের। ভালোটিয়াই তাকে কিনিয়ে দিয়েছে কয়েকখানা গাড়ি—বড় বড় বাস। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ধরে পাকড়ে বাস রুট পারমিট পেয়েছে। দিনান্তে কয়েকখানা গাড়ি দিকদিগন্তর থেকে ছুটে আসে ট্রিপ নিয়ে। বিক্রমের বড় ছেলে আসানসোলে বসেছে একটা বাড়ি নিয়ে, কারবার সেই দেখছে। মাঝে মাঝে বিক্রমনারায়ণও আসে।

কেমন যেন অন্য জীবনে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে বিক্রম। মনে মনে জন্মেছে দুরন্ত লোভ। কাঁচা পয়সার স্বাদ তার স্বভাব ধর্মকেও বদলে দিয়েছে। এগিয়ে চলেছে সে।

ভালোটিয়ার পরামর্শেই আসানসোল অঞ্চলে বেশ কিছু জায়গা কিনে ফেলে—এখান ওখানে। তবু কেমন ভয় করে জায়গা কিনতে।

—কিনে তো ফেললাম শেঠজী। কথাটা বলেও বিক্রম।

—আচ্ছা কিয়া, উস্‌কা কিস্মৎ জরুর বাড়েগা। চায় মাটিকা অন্দরসে কুছ কয়লা ভি নিকল সক্‌তা।

মনে মনে কি স্বপ্ন দেখে বিক্রমনারায়ণ, গ্রামের সাবেকী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শহরেই চলে আসবে। বিরাট বাড়ি গাড়ি—আরও কত কি যেন করবে সে।

চারিদিকে যে স্রোত বয়ে চলেছে সেই স্রোতের মাঝে সেও গা ভাসাবে। প্রাচীন বন্দীপুরের সেই সনাতন জীবনযাত্রা যেন কেমন ম্লান নিথর হয়ে এসেছে। ভালোটিয়া জানে এরূপ থাকবে না। তার কাছ থেকে বিক্রমও যেন নতুন মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছে।

ভালোটিয়ার তেলকল চলছে কয়েকটা। প্রজাপাটক ঠেঙ্গিয়ে তার সেই সনাতন জীবনযাত্রা অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে। কয়েক হাজার মজুর কর্মচারীর উপর থাকবে সে। বিক্রমও কারখানা গড়বে।

কালীপুরের তমসাচ্ছন্ন জীবন থেকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে সে। তারই চিন্তায় বিভোর।

ভালোটিয়া—কানোরিয়া—নারাণপুরের নবনী মিত্র সবাই যেন ব্যবসাতেই মেতে উঠেছে। বিক্রমনারায়ণকে ছাড়িয়ে গেছে তারা। সেদিন নবনী মিত্র কালীপুর বাজারে নতুন কেনা মস্ত ঝকঝকে গাড়ি থামিয়ে বিক্রমনারায়ণকে দেখে নেমে আসেন। কালীপুর কাছারিবাড়ির সামনে খোয়া ঢাকা রাস্তায় বর্ষার জল জমে খন্দ হয়ে উঠেছে।

এত লোকের সামনেই সেদিন বলে ওঠেন নবনী মিত্র,—

—বড়বাবু রাস্তাটা সাধারণকেই দিয়ে দেন। আপনাদের অসুবিধা থাকে তারাই করে নেবে ভালো পথ। এ যে কাঁদর হয়ে উঠলো দেখতে দেখতে।

বিক্রম হাসছে ওর রসিকতায়।

প্রতাপনারায়ণ বসে ছিল একপাশে, বিক্রম কিছু বলবার আগেই প্রতাপনারায়ণ বলে ওঠে—

—এখান দিয়ে হেঁটে যেতে হবে মিত্রমশাই, গাড়ি হাঁকিয়ে নয়। ঘোড়া বা পাল্কিতে যান নইলে হেঁটে।

মিত্রমশাই কেমার কোম্পানির কারখানা কিনেছেন সবে। নতুন যন্ত্রপাতি এনে কারখানা বাড়াবার চেষ্টা করছেন, ইচ্ছে আছে

রানীগঞ্জের বার্ন কোম্পানির চিনকুঠির মত বড় কারখানা বানাবেন। অর্ধেক কালীপুরের জঙ্গল মৌজা তাদের দখলে—বাকী বাজার এবং অর্ধকাংশ বিক্রমনারায়ণদের।

নবনী মিত্র মুখের উপর এমনি কাটা জবাব পাবেন কল্পনা করেন নি। কথাটা শুনে তাই একটু রাগ হয় মনে মনে।

বিক্রমনারায়ণ প্রতাপকে কথাটা ফস্ করে বলে ফেলতে দেখে একটু অপ্রস্তুত পড়ে যায়। নবনী মিত্রের কারবারে বিক্রমের দু-খানা ট্রাক মাল বইছে। দেনাপাওনার সম্বন্ধ। ওকে চটানো ঠিক নয়। বিক্রমনারায়ণ সামলে নেয়—ওর কথাবার্তা অমনিই নবীনবাবু, ঠাট্টার সম্বন্ধ কিনা তাই ঠাট্টাই করেছে। আসুন—আসুন। আস্তে আজ্ঞা হোক।

ঠাট্টা করেনি প্রতাপ, সাফ জবাবই দিয়েছে। কিন্তু বিক্রমের এই নির্লজ্জ খোসামুদিতে কেমন বিরক্তি বোধ করে। প্রতাপ উঠে গেল সেখান থেকে। নবনী মিত্র কি ভেবে কোঁচানো ধুতি সামলে মকরমুখো রুপোবাঁধানো দামী ছড়ি হাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। ব্যস্ত হয়ে হুকুম করে বিক্রমনারায়ণ—ওরে গোমস্তা কোথায় গেল।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল নোটন গোমস্তা। কোন্ অতিথির কেমন আপ্যায়ন হবে এটা তার নখদর্পণে। তখুনি আয়োজন হয়ে গেল। এলাহি আয়োজন।

বের হয়ে পড়েছে প্রতাপনারায়ণ। কেমন বিশ্রী ঠেকে সবকিছু। সেই দুর্দম চাপা পড়া স্বভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু-পাশের ঘন শালবনে লেগেছে ঝরাপাতার মর্মর। শীতের শেষ-পাতা ঝরছে শাল মহুয়া বনে।

হঠাৎ পেছনে কার গাড়ির তীব্র হর্নের শব্দ শুনে চমকে উঠল। স্তব্ধ নীরব ফুলগন্ধমুখর বনভূমির মাঝে বিজাতীয় শব্দটা কেমন একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। ঘোড়া চলেছে রাস্তা দিয়ে—পিছন

থেকে বার বার উঠছে হর্নের শব্দ। সতেজ ঘোড়া দাপাচ্ছে—একটু আলগা পেলেই লাগাম ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে নামবে মাঠে, না হয় ধাক্কা লাগাবে ওপাশের বনের গাছে; হঠাৎ ঘোড়াটা কেমন বেবশ হয়ে যায়, হাতের শক্ত মুঠি যেন ছিঁড়ে যাবে ওর ঘাড়ের টানে।

গাড়িখানা এক ঝলক তেলপোড়া ধোঁয়া ছেড়ে বের হয়ে গেল। নবনী মিত্রের ঝকঝকে গাড়ি—ওতে করে নটবর মুখুয্যে কোথা চলেছে যেন কি কাজে। অতর্কিত গতিশব্দে।

বেবশ ঘোড়াটা সামনের দু-পা তুলে দাপাচ্ছে। কোনরকমে সামলে নেয় প্রতাপনারায়ণ। মনে হয় গাড়ির ভিতর থেকে নটবর মুখুয্যে তার এই ক্ষণিকের বেকায়দা অবস্থাটা দেখে যেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করেছে দৃশ্যটা।

হাসছে নটবর, নবনী মিত্র। ওদের হাসির শব্দে রাগ বোধ করে প্রতাপ।

সারাদেহে অপমানের একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করে প্রতাপনারায়ণ। কোথায় যেন সে পিছনে পড়ে যাচ্ছে—দূরে চড়াই থেকে উৎরাই-এর নীচে নেমে গেছে গাড়িখানা—অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রতাপনারায়ণ গুম হয়ে গেছে।

কেমন যেন ঝড় উঠছে বনে। দমকা ঝড়—পত্রহীন ডালগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। শুকনো পাতাগুলো বাতাসে দল বেঁধে উড়ে আসে। ঘোড়াটা স্বাভাবিক চালে চলেছে—গ্রামের দিকে। প্রতাপনারায়ণ কি ভাবছে। বার বার মনে পড়ে নবনী মিত্র আর দালাল নটবরের ওই মুখখানা, হাসির তীক্ষ্ণ শব্দ।

কেমন যেন গরম বাতাসের একটা ঝলকা হুহু রোদপোড়া ডাঙ্গার দিক থেকে তেড়ে আসছে। হাঁপিয়ে ওঠে প্রতাপ। এমনি করেই সব একে একে হাতছাড়া হবে তা অনুমান করেছে প্রতাপ। তার অমতেই বিক্রম বিষয় বিক্রি করে নিজের ব্যবসায়ে ঢালছে।

কয়েকদিন আগেই বিক্রমের সঙ্গে তার দু-একটা কথার অবতারণা হয়েছিল।

মনটা বিষিয়ে ওঠে এসব ভাবতে।

জঙ্গলমহাল বিক্রি হয়ে গেছে, কিনেছে রানীগঞ্জের শেঠ ভালোটিয়া আর নবনী মিত্র দু-জনে। ব্যাপারটা তার কাছে গোপনই রেখেছিল এতদিন বিক্রমনারায়ণ। সংবাদটা প্রকাশ পেতেই সেদিন বড় ভাইকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে প্রতাপ।

—এটা কি শুনছি? জঙ্গলমহাল বিক্রি হয়ে গেছে।

জঙ্গলের উপর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল তার, যৌবনের কত দিন কত রাত্রি কেটেছে ওই গভীর গহনে; ওর সবুজ অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে বার বার। ভালো-বেসেছিল ওর মৃত্তিকা আর দুর্দম সেই বন্যজীবনকে। সেইটুকু নির্মমভাবে আজ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে ওই ধূর্ত বিষয়ী লোকটি। তাকে যেন বঞ্চিত করতে চায় পরম তৃপ্তি আর শান্তির রাজ্য থেকে। তাই খেপে উঠছে প্রতাপ।

বিক্রমনারায়ণ এর মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে। আসানসোলে ব্যবসা-পত্র খুলেছে, ট্রান্সপোর্ট কারবার, জমি জায়গাও। আর জমিদারির ওই সামান্য আয়টুকুর উপর ভরসা করতে হয় না তার—এটা যেন উপরি পাওনা, ফাউ। পয়সার মুখ দেখে একটু ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে।

জঙ্গল বিক্রির খবরটা আজ প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রতাপনারায়ণ তাই যেন বিক্রমের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, কৈফিয়ৎ নিচ্ছে। বিক্রমও বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

আজ প্রতাপের কথার জবাব বেশ সোজাসুজিই দেয় বিক্রম,—

—জঙ্গলের এক-তৃতীয়াংশ আমাদের পৈতৃক, বাকী দুই-তৃতীয়াংশ আমার শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে যৌতুক বাবদ

পাওয়া, জানো বোধ হয়? তাই ওটা আমিই বিচেছি। আমার সম্পত্তি ওটা।

প্রতাপ কোন কিছুরই খবর রাখেনি এতদিন—যা করেছে ওই বিক্রমনারায়ণ। আজ তাই ওই কথাটা শুনে চমকে ওঠে মনে মনে। বিক্রমনারায়ণের সঙ্গে মাঝে মাঝে তার এ রকম কথা কাটাকাটি যে না হয়েছে তা নয়। হয়তো কোন প্রজার বাকী কর মকুব করবার জন্য নায়েবকে রোকা লিখে দিয়েছে প্রতাপ। প্রতাপবাবুর রোকা দেখে নায়েবও নালিশের মুখে দিতে পারে না মামলাটা, বড়বাবুর দরবারে আনে মাত্র।

বিক্রমই প্রতিবাদ করেছে বহুবার প্রতাপের এই দরাজ দিলের। বলেছে বিক্রম ভাইকে বার বার।

—এমন করলে প্রজা শাসনে রাখা যাবে না।

প্রতাপ হাসে—প্রজার বাপকে শাসন করতে পারি আমি। এক্ষেত্রে খাজনা মকুব করে দাও।

প্রতাপের ঢালা হুকুম মানতে তবু রাজী হতে পারে না বিক্রম। প্রতাপের দান এই বিষয় অর্জনে প্রভূতা, তবুও কেমন তা মানতে রাজী নয় বিক্রম।

—এমনি করে দানসত্র করলে জমিদারি চলে?

বিক্রমনারায়ণ কারোও পাই পয়সা ছাড়তে রাজী নয়। গলা টিপে আদায় করে কাছারির প্রাপ্য। প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে এই নিয়েই মতান্তর হয়েছে বহুবার। শেষ পর্যন্ত প্রতাপের কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে নানা কারণে।

কিন্তু আজ সে ধরনের বচসা এ নয়। প্রতাপনারায়ণ দাদার দিকে চেয়ে থাকে। বিক্রম বলে চলেছে—

—জঙ্গলমহালের সেই শ্বশুরমশায়ের অংশই আমি বিক্রি করেছি। ওটা তোমার বৌদিরই প্রাপ্য। এক-তৃতীয়াংশ তেমনিই আছে। ওটা বিক্রি করবার অধিকার একা আমার নেই।

সাফ জবাব। আইনের ফাঁক নেই কোথাও।

প্রতাপ প্রশ্ন করে—আপনার শ্বশুরমশায়ের দেওয়া সম্পত্তি আর কোথাও কিছু আছে?

প্রতাপ যেন তাকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিদ্রূপ করছে।

বিক্রম যেন চটে ওঠে—কেন?

—তাই জেনে রাখছি। যাতে আপনার সঙ্গে মিছেমিছি এই রকম মতান্তর না হয়। জেনে রাখা ভালো।

বিক্রম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাই-এর দিকে চেয়ে থাকে।

নবনী মিত্র সেই থেকেই প্রতাপকে যেন ওর প্রতিটি কথায়—ব্যবহারে জানিয়ে দিতে চায় নবনী প্রতাপের অনেক উপরে। আজও বাড়ি থেকে তাকে বিদ্রূপই করে গেল।

সেদিনের বিক্রমের সেই দৃষ্টি আজও ভোলেনি প্রতাপ। দুপুরের রোদ সারা দেহে জ্বালা ধরায়। ঘোড়াটা যেন হাঁপাচ্ছে। তামাটে পোড়ামাটির ওদিকে শালবন থেকে থেকে আসছে উত্তপ্ত আগুনের হল্‌কা। হঠাৎ ওদিকের কাঁদরে এতটুকু কাদাজলে কালোমত কয়েকটা জানোয়ারকে লুটোপুটি খেতে দেখে চড়াই-এর মাথায় গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়াল প্রতাপনারায়ণ। বনে কোথাও জল নেই—ডোবা খালখন্দ শুকিয়ে গেছে তাই বোধ হয় বের হয়ে এসেছে এই অসহ্য গরমে ওই দাঁতাল শুয়োরের দল। হাত নিশপিশ করছে; কিন্তু সঙ্গে হাতিয়ার কিছুই নেই। ঘোড়াটা বাতাসে নাক তুলে কি যেন শুঁকছে বার বার। সেও বোধ হয় টের পেয়েছে ওদের অস্তিত্বের।

কি ভেবে চুপি চুপি ঘোড়াটার মুখ ফিরিয়ে গ্রামের দিকে ঢুকল প্রতাপ। নির্জন দুপুরের রোদবেলাটা শুয়োরগুলো বনের ধারে কাঁদরে থাকবে, আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে সে তৈরী হয়ে। কেমন যেন হাত নিশপিশ করছে।

অনেকদিন শিকারে বের হয়নি—আবার সেই দুর্দান্ত মানুষটি কেমন জেগে ওঠে, সারা মনে সেই ঝড়ের মাতামাতি চলেছে।

বন্দুকটা নিয়ে বের হয়ে যাবে বনের সেই পুকুরটার দিকে বুনো-শুয়োর শিকারের আশায়, বার বাড়ি পার হয়ে অন্দরে ঢুকবার মুখেই কার কান্না শুনে থমকে দাঁড়াল প্রতাপ। মেয়েমানুষের কান্না।

হাতের রাইফেলটা নামিয়ে এগিয়ে আসে—

—কি ব্যাপার?

সীতাও ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল কাছে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও যেন নিশ্বাস বন্ধ করে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। একটি মেয়ে কাঁদছে। হঠাৎ প্রতাপের মনে হয় ওকে দেখেছে কোথায়। ঠিক মনে করতে পারে না।

হ্যাঁ। কালীপুর ইউনিয়ন বোর্ড আপিসের কাছে দেখেছিল ওকে। মুহুরী হরিনারায়ণ কি যেন বলছিল। এখান পর্যন্ত এসেছে নালিশ জানাতে।

সীতা কিছু বলবার আগেই প্রতাপনারায়ণ শিকারে যাবার আগে বাধা পেয়ে মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। প্রতাপই বলে—

—মাথাখারাপ মেয়েটা এখানেও এসে জুটেছে?

সীতা জবাব দেয়—মাথা খারাপ? কার? ওর ইতিহাস জানো না—নইলে একথা বলতে না। ওই নটবর মুখুয্যে ওর সর্বনাশ করেছে। জানোয়ার একটা!

প্রতাপ ওর নাম শুনে দাঁড়াল। শিকারী যেন বাতাসে কিসের গন্ধ পেয়েছে। নটবর সব পারে। আজ দুপুরের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে। পরের দালালি করে খায়। তাই করেই তার প্রাধান্য। শিয়ালের মত ধূর্ত—সাপের চেয়ে নিষ্ঠুর। প্রতাপ একটা সুযোগ পেয়েছে। জ্যান্ত শিকারের সুযোগ।

—কি করেছে নটবর?

মেয়েটিই বর্ণনা করে তার কাহিনী। সীতা চুপ করে দাঁড়িয়ে

আছে। কেমন করে নটবর তার সর্বনাশ করেছে, স্বামীকে হত্যা করেছে নিষ্ঠুরভাবে—তাকে কালীপুরের বসতবাড়ি, জমি, বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে পথে দূর করে দিয়েছে। বসন্ত নায়েকের বৌ আজ পথের ভিখারী—ওরা শাসিয়েছে কালীপুরে তাকে দেখতে পেলে প্রাণে মেরে ফেলবে এইবার।

গর্জে ওঠে প্রতাপনারায়ণ—নটবর কি কালীপুরের মালিক?

মধ্যবয়সী বৌটি দু-চোখের জল মুছে ওর দিকে চেয়ে থাকে। কোথাও কোন বিচার না পেয়ে এইখানে এসেছে।

—বলে ওঠে প্রতাপের কথায়—তা জানি না বাবা। ও সব পারে। নইলে এ চাকলায় একটি মানুষ নাই যে তার বিরুদ্ধে কথা বলে—একটি মানুষ নাই।

কাঁদছে মেয়েটি। প্রতাপ কি যেন ভাবছে। অসহায় অনাথা বিধবা, আজ নটবরের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। দুঃখ হয় তার জন্য। চাপা রাগটা জেগে উঠেছে। বসন্ত নায়কের কথা মনে পড়ে প্রতাপের খুব পরিচিত ছিল সে। তার স্ত্রীর উপর অকথ্য এই অত্যাচার চলেছে তারই জমিদারিতে অথচ সে জানে না। বলে ওঠে প্রতাপ—

—এতদিন আসোনি কেন? নালিশও জানাওনি?

—নটবর সবকিছু ফিরিয়ে দোব বলেছিল। তাছাড়া মেয়েমানুষ যাবোই বা কোথা! পয়সার জোর নাই যে মালিমকর্দমা করবো।

নায়ক-বৌ জবাব দেবার চেষ্টা করে।

সীতা ওকে সান্ত্বনা দেয়—থাম মা কেঁদো না তুমি। একটা ব্যবস্থা যা হয় হবে।

স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে সীতা, ওর চোখেও জলের আবছা আভাস। প্রতাপ কি ভাবছে। তারই চোখের উপর এই অত্যাচার সহ্য করতে কেমন যেন বাধে। স্বামীকে অনুরোধ করে সীতা।

—কিছু করা যায় না, হাঁগো ?

সীতা আবেদন করছে স্বামীর কাছে। দুর্মদ মানুষটি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে। অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন রাত্রে মৃত্যু-দূতের সামনে যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করেছে সেই মানুষটি জেগে ওঠেক্রমশঃ; সব বাধা ঠেলে সে জেগে উঠছে। সীতার কথায় জবাব দেয়।

—হয়! হবে।

প্রতাপনারায়ণ বের হয়ে এলে বারবাড়িতে। একটা প্রতিকার এর করা দরকার। কি সে প্রতিকার তাও জানে প্রতাপ। তাইই করবে।

—অনা!

অনুকূল কিছুদিন জিরান পেয়েছিল। ছোটবাবুর ওই গলার ডাক শুনে বের হয়ে এল খুপরি থেকে। প্রতাপ স্থির করে কণ্ঠে হুকুম দেয় তাকে।

—একটু বেরুতে হবে এখুনিই—তৈরী হয়ে নে।

বিস্মিত হয় অনা।

—দুপুরবেলায় শিকার ছোটহুজুর ?

—হ্যাঁ! দিনেদুপুরেই। থমথমে কণ্ঠে জবাব দেয় প্রতাপ।

অনুকূল কথা বলে না, একটু বিস্মিত হয়, কে জানে কি ব্যাপার। আপনমনে টোটাগুলো কেশে পুরতে থাকে। কোণে কাঠের বন্দুক র‍্যাক থেকে দুটো বন্দুক তুলে নেয়।

হঠাৎ গ্রামের লোক সচকিত হয়ে ওঠে। নটবর মুখুয্যের বাড়ির দরজায় হানা দিয়েছেন প্রতাপনারায়ণ স্বয়ং। রোদে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘামে দামী জামাটা ভিজে লেপটে গেছে দেহের সঙ্গে।

পাড়ার লোকও খবর পেয়ে ছুটে এসেছে মজাটা দেখতে। ভিড় জমে যায় কৌতূহলী জনতার। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছে তারা।

—কোথায় নটবর, তাকে বের হয়ে আসতে বলো। এখুনিই—

খাওয়া দাওয়ার পর বাইরে থেকে ফিরে নটবর এক দিবানিদ্রার আয়োজন করছিল। অসময়ে এই রুদ্র মূর্তিতে ছোটবাবুকে বন্দুক হাতে হানা দিতে দেখে চমকে উঠছে।

নটবর উপরের জানলা থেকে দেখে ছোটবাবুকে—বন্দুকহাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ চাকলায় এমন কেউ নেই যে ওকে ফেরাতে পারে। বাড়িতে ঢুকবেই, দরকার হলে কুকুরের মত গুলি করে মারবে। ব্যাপারটা আগেই এসে জানিয়েছে হরিনারায়ণ। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি তার কথা।

—পালান মুখুয্যেমশায়, যেখানে পারেন পালান। আজ নিস্তার নেই। মাগী গিয়ে ওদের বাড়িতে কেঁদে-কেটে পড়েছে। শুনলাম ছোটবাবুও বের হচ্ছেন বন্দুক হাতে।

প্রথম প্রথম গর্জন করে নটবর—মগের মুলুক নাকি?

কিন্তু সত্যিই যে তাই এটা এখন যেন বুঝতে পারে মুখুয্যে। এখন কি করা যায় তাই ভাবছে নটবর। পথ একদিকে খোলা।

বাইরে থেকে চীৎকার কানে আসে—নটবর কোথা?

অনা ডোম হঠাৎ বলে ওঠে—উই যে ছোটহুজুর, মুখুজ্যে বাঁধের পাড় দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে মনে হয়।

প্রতাপ গর্জন করে ওঠে কঠিন কণ্ঠে—

—ধরে আন।

হুকুম পাবামাত্র অনুকূল আর ভোলা মাঝি ছুটল ওর পিছু পিছু। ছোটবাবুও চলেছে। পিছনে পিছনে চলেছে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কৌতূহলী জনতা। এ গ্রামে সে গ্রামে হাওয়ায় খবরটা ভেসে গেছে; নটবর মুখুয্যেকে কেউই ভাল চোখে দেখতো না, তাদের চাপা প্রতিবাদ আর ঘৃণা আজ প্রকাশ পেয়েছে এই ফাঁকে। মজা দেখছে সবাই।

নটবর দৌড়চ্ছে। বাঁধের ওপারে করঞ্জপাড়া, গ্রামে ঢুকে কোথায় উপে গেল। পিছু পিছু অনা ডোম—ভোলাও হাজির। তার একটু পরেই প্রতাপনারায়ণ, পিছনে বেশ কিছু জনতা।

কে যেন বলে—শালা শিয়ালের মত গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। বোঝ ঠ্যালা এইবার ব্যাটা শিয়াল।

—এদিকে যে শিয়ালের বাবা পিছু নিয়েছে হে, দেখছো না।

অনাই খবরটা দেয়—আজ্ঞে সতীশ হাজরার বাড়িতে ঢুকে হাজরার পা ধরে পড়ে আছে।

—ডাক হাজরাকে।

প্রতাপ পথে দাঁড়িয়ে থাকে।

সতীশ হাজরা সংগতিপন্ন জোতদার, গ্রামের প্রবীণ সম্মানী ব্যক্তি। চাষবাস গরু বাছুর ধানের গোলা ভর্তি উঠান—সংগতিপন্ন পত্তনিদার বিশিষ্ট ভদ্রলোক। স্বয়ং জমিদার বাবুর অভ্যর্থনার জন্য শশব্যস্ত হয়ে ওঠে সতীশ হাজরা। ছোটবাবুকে গলদঘর্ম অবস্থায় পায়ে হেঁটে তারই বাড়ির সামনে আসতে দেখে জোড়হাতে এগিয়ে আসে—আসুন, আসুন। এই রোদে।

প্রতাপনারায়ণ কোন লৌকিকতা রাখতে আসেনি। এসেছে কঠিন একটা কাজ নিয়ে। এর মীমাংসা না করে আজ সে যাবে না। তাই সতীশের কথার জবাব না দিয়ে পথে দাঁড়িয়ে অন্য কোন ভূমিকা না করেই হুকুম করে প্রতাপনারায়ণ—নটবরকে বের করে দাও। তোমার বাড়িতে ঢুকেছে সে।

—একটু জিরোন হুজুর, বের করে দিচ্ছি এখুনি।

—আগে আনো, পরে জিরোব। শয়তানকে গুলি করে মারবো আজ। চিন্তায় পড়ে সতীশ। আশ্রিতকে রক্ষা করা ধর্ম।

সতীশ হাজরা বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখে নটবর ঠক ঠক করে কাঁপছে। মুখ চোখ সাদা ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে গেছে। সতীশ হাজরার পা চেপে ধরে কাঁদছে—বাঁচাও হাজরামশাই। জীবনে আর

এ কাজ করবো না। সব ফিরিয়ে দোব নায়েক-বৌকে। দোহাই তোমার। সতীশ হাজরা সব শুনে মনে মনে কি ভাবছে।

হাজরা বিচক্ষণ লোক, ছোটবাবুর অন্তরের কথা জানে। কি ভেবে এগিয়ে গেল বাইরে। প্রতাপনারায়ণ জলটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করে নি, পথেই দাঁড়িয়ে আছে—পথের উপর সেই রোদেই।

ওকে দেখে বলে ওঠে—কি হল? সে কই?

—নায়েক-বৌকে সব ফিরিয়ে দোব বলছে; জীবনে আর এমন কাজ করবে না। সতীশ যেন অনুনয় করছে। প্রতাপ কঠিন সুরে বলে—

—এখুনিই লিখে দিক, আজই, এই মুহূর্তে বাড়ি, জমির দখল দেবে। তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে। শুধু এই শর্তে রাজী আছি নটবরকে ছেড়ে দিতে, নইলে—

প্রতাপনারায়ণ রাগে যেন জ্বলছে। সতীশ হাজরা হাতজোড় করে শান্ত করবার চেষ্টা করে।—ছোটহুজুর এত লোকের সামনে এমনি একটা ব্যাপারের মীমাংসা আজ না করলেই নয়?

প্রতাপনারায়ণ বলে ওঠে—বাইরে জমে গেছে কয়েকশো লোক। তারা গর্জন করছে—না। এইখানেই এখুনিই এর মীমাংসা করে—

বের করে দাও শালাকে, ফড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাবো ওটার।

এতদিন ওরা সব সহ্য করে এসেছে।

উত্তেজিত জনতা শেষকালে সতীশ হাজরার বাড়িই না চড়াও হয়। সতীশও ভয় পেয়ে গেছে, এ সব নোংরা ব্যাপারে সে নিজেকে জড়াতে চায় না।

—ওই করে মীমাংসা করে দেন ছোটহুজুর।

প্রতাপনারায়ণ হুকুম করে—এখুনি এখানে এসে লেখাপড়া করে দিক, তুমি তার জামিন থাকো। আর বাইরে গিয়ে জোড়হাত করে ওই লোকদের সামনে ক্ষমা চাক—নিয়ে এসো তাকে।

কাঁপতে কাঁপতে এসে প্রতাপনারায়ণের পায়ের কাছে সশব্দে আছড়ে পড়ল নটবর মুখুয্যে। কয়েক ঘণ্টা আগে নবনী মিত্রের দামী গাড়িতে চড়ে হাসতে হাসতে যে মানুষটি যাচ্ছিল সে কোথায় হারিয়ে গেছে নিঃশেষে।

কাঁপতে কাঁপতে কাগজে সই করল নটবর।

প্রতাপনারায়ণ কঠিন স্বরে বলে ওঠে নটবরকে—

—এখুনি গিয়ে তার পা ধরে মাপ চেয়ে কালীপুরের বাড়িতে এনে দখল দিতে হবে তাকে।

নটবর কি বলতে যাবে, প্রতাপনারায়ণ ধমকে ওঠে—

—কোন ভয় নেই, কেউ কিছু করবে না। চল।

বাইরে কয়েকশো মারমুখী জনতা দেখে ভয় পেয়েছে নটবর। প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে বের হতে জনতা চুপ করে তাদের পথ দেয়। এগিয়ে চলে তারা বাড়ির দিকে।

সীতাও খবরটা শুনে চমকে ওঠে, সাড়া বাড়ির মেয়েরা ছাদ থেকে রাস্তার দিকে থাকে। কালীপুর—করঞ্জপাড়া—ঝিলিপুরের লোক জমে গেছে। শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসছে তারা নটবর মুখুয্যেকে।

সারা কালীপুরে সাড়া পড়ে গেছে। লোকের মুখে মুখে প্রতাপনারায়ণের কথা। এতদিন বাঘ শিকার করে লোকের যে ভয় আর আতঙ্কের কারণ হয়ে ছিল প্রতাপ, সেই প্রতাপনারায়ণ রাতারাতি বহুলোকের শ্রদ্ধা অর্জন করে ফেলে। দু-পাশের লোক অকারণেই প্রণাম করে তাকে।

—ভাল আছেন ছোটহুজুর?

প্রতাপনারায়ণ পথ দিয়ে গেলে যেন সাড়া পড়ে যায়। শ্রদ্ধা করে আবালবৃদ্ধ বণিতা।

কিন্তু অনেককিছুর বিনিময়ে এই প্রীতিটুকু পেয়েছে প্রতাপনারায়ণ। সবাই জানে না এ খবর—সীতাও জানে সামান্য-

মাত্র। বিক্রমনারায়ণ সেই ঘটনার পরদিনই প্রতাপকে কাছারি বাড়িতে ডেকে নিয়ে পরিষ্কার কথাটা জানায় সেদিন। অন্য সবাই এটাকে প্রশংসার চোখে দেখলে বিক্রম-নবনী-ভালোটিয়ার দল এটাকে মোটেই ক্ষমার চোখে দেখে না। বিক্রমের ব্যবসায়ও ক্ষতি হতে পারে এতে।

তাই বিক্রম বলে ওঠে—এভাবে চললে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

চমকে ওঠে প্রতাপ। এই ব্যবহার সে আশা করেনি। প্রতাপনারায়ণ বিক্রমের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অদৃশ্য কোন সন্ধিপত্রে বিক্রম ওই শয়তানদের সঙ্গে স্বাক্ষর করেছে। একজোট হয়ে তারা আজ স্বর্ণমৃগয়ার স্বপ্ন দেখে। সারা মন ভরে ওঠে বিজাতীয় ঘৃণায়। বলে ওঠে প্রতাপ—

—লোকটা একের পর এক এত বড় অন্যায় করে চলেছে তাকে সহ্য করবো তবুও? অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা আমার রক্তে নেই। তাই প্রতিবাদ করেছি।

বিক্রম বলে ওঠে—শুনেছি তুমি নাকি বসন্ত নায়কের স্ত্রীকে চিনতে। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারগুলো এমনি প্রকাশ্যে দিনের আলোয়—

দপ্ করে জ্বলে ওঠে প্রতাপ। আজ নবনী-নটবর-বিক্রমদের দলকে যেন খানিকটা চিনতে পেরে শিউরে উঠেছে ঘৃণায়। মাথায় উষ্ণ রক্ত প্রবাহ বয়।

গর্জে ওঠে প্রতাপ—চুপ করুন আপনি। আর একটি কথাও বললে—

প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে; সমস্ত দেহের রক্তস্রোত যেন মুখে এসে চলকে উঠেছে। টক টক করছে ফরসা রং।

বিক্রম বলে—গায়ে হাত তুলবে নাকি?

প্রতাপ তেজদীপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—অন্য কেউ হলে আগেই

হয়ে যেতো। ভবিষ্যতে এমন কথা কোনদিন না বললেই ভালো করবেন।

বের হয়ে গেল প্রতাপ।

বাইরে রাতের হাওয়া বইছে—হু হু হাওয়া; বনের দিক থেকে হিমেল বাতাস আনে তৃপ্তির স্পর্শ; প্রতাপনারায়ণ মুক্ত উদার প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একা। চারিদিকে মাতামাতি ঝড় যেন মনের উত্তাল বিক্ষোভকে ফাঁপিয়ে তুলেছে ঝড়েমাতা নদীর মত। প্রতাপনারায়ণ যেন রাজ্যজোড়া বিক্ষোভের আবর্তে ছিটকে পড়েছে।

প্রদীপ কলকাতায় এসে কয়েক বৎসরেই কেমন যেন বদলে গেল। এতদিন যেন বদ্ধ কূপের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বন্দী হয়েছিল—আজ বিরাট পৃথিবীর মধ্যে এসে পড়েছে। এর সীমা মামড়ার গহন জঙ্গল অন্যদিকে কালীপুর স্টেশন পার হয়ে দামোদরের বিস্তীর্ণ বালুচর—অন্যদিকে আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়; ভূগোলের সীমা পার হয়ে এখানে ইতিহাস আর রাজনীতি একাকার হয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম এসে কেমন যেন একলা ঠেকে, কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। একক অসহায় যেন সে—বাবা তাকে নির্বাসন দিয়েছে এই মহানগরীতে, হাজারো মানুষের মধ্যে সে একা। হোস্টেলের সামনে রাস্তার ওপারে কলেজের মাঠের মধ্যে সারবন্দী দেওদার মেহগিনী গাছে বৈকালের শেষ আলো ম্লান আভা আনে। ধোঁয়া-ধুলো ঢাকা মহানগরী। এমনি পড়ন্ত বেলায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে মামড়ার ঘন জঙ্গল-সীমা, সবুজ ধানক্ষেতের পারে লাল ডাঙ্গাটা উঠে গেছে ক্রমশঃ কোঁকড়ানো শাল-পলাশ-কেঁদ গাছের শ্রেণী ঘনবনের স্পর্শে মিশে গেছে দিকচক্রবালরেখার সঙ্গে। উড়ে যায় নিঃসঙ্গ একটি পাখী। মন কেমন করে একা একা।

নিঃসঙ্গ অপরাহ্ণে মন তাই উধাও হয় তার ফেলে আসা সেই

শান্তিময় জগতে। রুমমেটও কোথায় গেছে। প্রদীপের একা ঘরেই কাটে এমনি উদাস অপরাহ্ণ বেলা দূরের পথচেয়ে।

—কি করছেন প্রদীপবাবু একা একা?

রুমমেট বসন্ত এগিয়ে আসে—আপনি কি কবি-টবি নাকি মশাই, এত চুপচাপ থাকেন?

হাসে প্রদীপ, কি করে জানাবে তার মনের সেই গোপন চাঞ্চল্যের কথা। কেমন করে তার মন কাঁদে এমনি বৈকালে। দল বেঁধে তারা আসত কালীপুর স্টেশনের দিকে। ঘুমন্ত স্টেশনটা বৈকালের শেষ আলোয় জেগে উঠত, হাটফেরত তরকারিওয়ালা, চাষী—কত দূর-দরান্তরের যাত্রী দাঁড়াত ট্রেনের প্রতীক্ষায়, শালবনের গভীর থেকে ট্রেনখানা এসে দাঁড়াল, কয়েক মিনিট মাত্র, তারপর আবার চলে যায়। উধাও হয়ে যায় যাত্রীরা—ব্যস্তসমস্ত হয়ে নদীর পারে যাবার জন্য মেঠো পথে হারিয়ে গেল।

কালীপুরে স্তব্ধতা নামে; ওরা জনহীন পথ ধরে গ্রামের দিকে ফেরে—যেন দিনশেষের পাখী। স্তব্ধ বনানীর অসীমে এসে আশ্রয় নিল রাতের তমসায়।

এখানের কর্মব্যস্ততার ভিড় আর থাকে না, এই পরিবেশের সঙ্গে কোথাও এর মিল নেই। মহানগরীর বিচিত্র জীবনযাত্রার ভিড়ে কালীপুরের কোন ঠাঁই নেই।

এখানে সেই জীবন কোথায় হারিয়ে গেছে; হারিয়ে গেছে সেই বন্য জীবন। রাতের আঁধারে বনে বনে চলেছে শিকারের সন্ধানে—কোথায় ঝাঁকবন্দী জোনাকি জ্বলছে, বাতাসে কি যেন তীব্র গন্ধ—কোন হিংস্রপ্রাণীর কঠিন অস্তিত্ব। সেই উন্মাদনাময় জীবনের স্বাদ শহরবাসী বন্ধু বসন্তকে বোঝাবে কেমন করে! কেমন করে জানাবে তার অপূর্ব প্রশান্তি।

তাই চুপ করেই থাকে প্রদীপ। বসন্তই বলে ওঠে—

—চলো একটু বেড়িয়ে আসি। ওঠো।

টেনে সেই-ই ওকে পথে নিয়ে যায়। কলকাতা চেনায় তাকে বসন্তই। শ্যামবাজার থেকে বালীগঞ্জ। উত্তর কলকাতার সাধারণ মাঠো বাঙালী রূপ—দক্ষিণের আধুনিক প্লাবনের ঢেউ আর চৌরঙ্গীর উদগ্র কামনা-মদির জীবন-স্রোতের সামনে এনে দাঁড় করায় প্রদীপকে ওই বসন্তই।

ক্লাস থেকে হোস্টেলে ফিরে দেখে বসন্ত আগের পিরিয়ডে অফ হয়ে এসে একমনে পড়ছে। অসময়ে রাত্রি গভীরে তার পড়াশোনার কামাই নেই, যেমনি পড়াশোনায় তেমনি আড্ডাতে নিপুণ। চারিদিকে চৌকস। ক্রমশঃ তাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

তার সঙ্গেই প্রদীপ প্রথম যায় শীলাদের বাড়ি। বসন্তের দূর সম্পর্কের আত্মীয় অবিনাশবাবু—শীলার বাবা।

কলকাতার বন্ধু বান্ধবহীন ঊষর জীবনে বন্ধু বসন্তই আনে শান্তির স্বাদ, ওদের বাড়িতে গিয়েও তেমনি একটু আন্তরিকতার সন্ধান পায় প্রদীপ। বাড়িতেও এই প্রীতির স্পর্শটুকু যেন অনেক সময় সে পায়নি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসার—নিজের পেন্সনে আর ছেলেদের রোজগারে কোনোরকমে সংসার চলে যায়। প্রদীপকে বসন্তের সঙ্গে আসতে দেখে অভ্যর্থনা জানান শীলার মা। সাধারণ চাকরি করতেন অবিনাশবাবু—স্টেশনমাস্টার ছিলেন; প্রদীপের পরিচয় শুনে নিজেই এসে হাজির হন।

—কালীপুর স্টেশনে আমি ছিলাম, তোমাদের নাম-ডাক শুনেছি। অবসর নিয়ে কোনো কাজকর্ম নেই, তেমনি গল্পবাজ স্বভাবটাকেও ছাড়তে পারেন নি—তাই অতীতের কথা বলবার লোক পেয়ে যেন খুশীই হন অবিনাশ বাবু। বলে ওঠেন, কই গো।

হাঁকডাক করে বাড়ির ভিতর থেকে ডাকিয়ে স্ত্রীকে এনে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি—মস্ত জমিদার গো বন্দীপুরের চাটুয্যেরা, বাঘে বলদে একঘাটে জল খায় ওদের দাপটে। তা সেবার

মামড়ার জঙ্গলে তুমিই রয়েল টাইগার মেরেছিলে না, এগারো ফুট ক-কঞ্চি ?

লজ্জায় পড়ে প্রদীপ ওঁর কথায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অবাক হয়ে একটি মেয়ে, কেমন কালো কাঁচ-কাঁচ গড়ন। দু-চোখে ওর পুঞ্জীভূত বিস্ময়। বসন্ত বলে ওঠে—

—তোমার এত গুণ তা তো বলোনি হে, এ যে দেখছি আমিই ফল্‌স্ পজিসনে পড়ে গেলাম তোমায় এখানে এনে। মায়ের কাছে মাসীর গল্প বলা হয়ে গেল যে।

হাসছে শীলা। বসন্তই ডাকে তাকে—

—এগিয়ে আয়, শুধু স্কলারই নয় মস্ত শিকারীকে ধরে এনেছি। তা সাহস আছে বলতে হবে। চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখেই কেঁপে উঠি—জঙ্গলের ভিতর জ্যান্ত বাঘ মারা—উরে বাপ্‌রে। ওরা সেই বাঘ মারে গুলি করে।

হাসছে প্রদীপ ওর কথায়। শীলা এদিকে ভাঙ্গা টুলখানা নিয়ে বসলো।

প্রদীপ ঘরের চারিদিক চেয়ে দেখেছে। মধ্যবিত্তের সংসার। টেবিলের উপর হাতের-কাজ-করা টেবিলক্লথ, কয়েকখানা বই নামানো, পাশেই পালিশ-ওঠা একটা আলমারিতে কিছু বই-খাতা; দেওয়ালে পেরেক পুঁতে টাঙানো একটা আয়না, পাশে ছোট্ট র‍্যাকে একটা হিমানী—কি যেন একটা পাউডারের কৌটো।

কোনরকমে নেহাত ভদ্রতার খাতিরেই প্রশ্ন করে প্রদীপ—কোন্ ইয়ার আপনার ?

শীলা জবাব দেয়—সেকেণ্ড ইয়ার, আপনাদের মত স্কলারশিপ পাবার স্ট্যাণ্ড করার স্বপ্নও দেখি না, কোনরকমে টায়টোয়ে পাস করাটাই পরম ভাগ্য আমাদের।

বসন্ত হাসে। শীলা বলে ওঠে বসন্তকে—তুমি হেসো না। তোমার বরাতেও তাই, এমন কিছু আহা মরি ছেলে তুমি নও

বসন্ত-দা, ওই রাজনীতির ভূত ঘাড়ে চাপলে তার দফা গয়া। তোমার হয়েছে তাই।

বসন্ত কথা বলে না। সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেওয়া তার অভ্যাস।

শীলার কথাগুলোও গায়ে মাখে না বসন্ত। প্রদীপকে অবিনাশ-বাবু অতীতের কাহিনী শুনিয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে শীলা চা নিয়ে আসে আর প্লেটে করে কিছু চিঁড়েভাজা। বেশ সহজভাবেই প্রদীপকে বলে—

—চলবে তো, যে সব বিশেষণ শুনলাম আপনার সম্বন্ধে, তারপর সামান্য চিঁড়ে-মুড়ি এনে হাজির করা যায় না। শীলার ডাগর চোখের দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে বলে প্রদীপ। যেন নিজেই অপ্রতিভ বোধ করে ওর কথায়। জমিদারদের সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহল তাদের মনে রয়েছে।

প্রদীপ বলে ওঠে—না, না। বাড়িতেও তো এই খাই। আপনি এত ব্যস্ত হবেন না।

বসন্ত মাথার একরাশ উস্কখুস্ক চুলে আঙুল চালাতে থাকে—চোখের হাই-পাওয়ার চশমাটা খুলে জামার খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে বলে ওঠে—"চিতাভস্মে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" ও না খেলে এবার ডান হাত যে অচল হয়ে যাবে, প্রদীপ তাই এখন থেকেই চিঁড়ে-মুড়ি রপ্ত করছে। আর তাতেও বেশ ক্যাপিটালিস্ট মেণ্টালিটি ফুঠে উঠেছে।

শীলাই ধমক দিয়ে ওঠে—থামাবে তোমার সেই একঘেয়ে রাজনীতি? নিন প্রদীপবাবু।

বসন্ত থেমে যায়।

প্রদীপ সহজভাবেই মিশতে পারে ওদের সঙ্গে।

রাত্রি হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে ওঠে প্রদীপ। এতক্ষণ কোন্‌দিকে কেটে গেছে একথা সেকথায় খেয়ালই করেনি

কাল পড়াশোনা অনেক রয়েছে। থার্ড ইয়ারে উঠে থেকে পড়াশুনোয় যেন বেশ ঢিল দিয়েছে সে, নিজেরই উপর কোন বিরক্তি আসে। উঠে পড়ে প্রদীপ—আজ চলি, রাত হয়ে গেছে।

শীলাই বলে ওঠে—পড়াশুনোর অনেক ক্ষতি হল আজ। অবশ্য তারজন্য আমিই দায়ী।

—না, না। প্রদীপ জবাব দিয়ে বের হয়ে আসে।

বসন্ত কোন কথাই বলে না, ট্রাম লাইন অবধি চুপ করে আসে।

প্রদীপের মনে কেমন একটা সুরের অনুরণন। বারে বারে মনে পড়ে শীলার সহজ সাবলীল ব্যবহার আর হাসির আভায় উলসে-ওঠা তার কালো দুটো চোখ। বার বার সব চিন্তা ছাপিয়ে যেন মনে জাগে ওই উজ্জ্বল একটি ছবি।

বসন্তের কাছেই প্রথম শোনে প্রদীপ একটি নাম। চামড়ার বাঁধানো বইখানা ওর হাতে আসে,

—পড়ে দেখো ভালো করে।

বসন্তের দিকে চেয়ে থাকে প্রদীপ। বসন্ত বলে চলেছে, যত আলোচনা জল্পনা-কল্পনা হয়েছে অন্য কোন বই নিয়ে এত হয়নি।

প্রদীপ বসন্তের দিকে চেয়ে থাকে। বসন্ত মাঝে মাঝে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ হালকা যে ছেলেটাকে দেখা যায় এ সে নয়।

বসন্ত বলে চলে—পড়ে বোঝাবার চেষ্টা করো। প্রতিটি লাইনে এর বহু তত্ত্ব আর তথ্য, আজকের দিনের সমস্ত কিছু সমস্যা আছে এতে। পড়ে হয়তো তুমিও চমকে উঠবে।

—কেন? প্রদীপ বলে ওঠে।

—পড়লেই বুঝতে পারবে।

কি যেন নেশার ঘোরে পড়তে শুরু করে বইখানা ; সোনালী কালিতে লেখা ইংরেজী অক্ষরে নামটা।

একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে মনে-মনে। কালীপুর—বন্দীপুর—করঞ্জপাড়ার প্রতিটি মানুষের কথা, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের কাহিনী, কেমার কোম্পানির অর্ধনগ্ন চিনেমাটির সাদা অস্তরমাখা মানুষের মুখগুলো ভিড় করে আসে। ভিড় করে আসে বিক্রমনারায়ণ, সেই অনুষ্ঠানের রাত্রিতে দেখা রানীগঞ্জের শেঠ ভালোটিয়া—ধূর্ত নটবর মুখুয্যের মুখখানা। সব যেন একটি সমগ্র চিন্তার পূর্ণ প্রকাশ ওই বই-এর ছত্রে ছত্রে তাদের স্বরূপ কার্য-কারণ সব বিশ্লেষণ করে রেখেছে।

নতুন চোখে যেন কালীপুরের জীবনকে বিশ্লেষণ করতে শেখে, বিশ্লেষণ করে আজকের প্রতিটি ঘটনাকে।

হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে যায় শীলার সঙ্গে রাস্তায়। কয়েকখানা বই-এর সন্ধানে কলেজ স্ট্রীটে ঘুরছে, শীলা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল প্রদীপ। এগিয়ে যায় কি আগ্রহ নিয়ে।

—আপনি? চমকে উঠেছে শীলা।

শীলার কালো চোখে সেই হাসির আভা, কপালের উপর থেকে দামাল হাওয়ায় উড়ে পড়া চুল ক-গাছি সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—যাক চিনতে পেরেছেন তাহলে!

হঠাৎ প্রদীপের হাতের নতুন কেনা বই ক-খানার দিকে নজর যেন কি এক আবিষ্কার করে ফেলে সে।

—বাঃ দীক্ষা হয়ে গেছে দেখছি। হাসছে শীলা।

প্রদীপ একটু বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে—কি হল? দীক্ষা-টীক্ষা কি বলছেন? ঠিক বুঝলাম না তো?

—এমনিই! শীলা কথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

বৈকাল হয়ে আসছে। ট্রাম বাসের ভিড়ও বেড়ে চলে। পার্টিশনের পর কলকাতা শহর, রাস্তায় ট্রামে বাসে লোক ধরে না, যেন উপড়ে পড়ছে জনতা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে উঠেছে শীলা। প্রদীপই বলে ওঠে—

—চলুন কোথাও একটু চা খেয়ে নিই, ততক্ষণে বাসের ভিড় কিছুটা কমবে।

বৈকালের ম্লান রোদ দেওদার গাছের সবুজ পাতায় এসে লেগেছে। পাথরের রাজত্বেও পাখী ডাকে, রঙীন সন্ধ্যা নামে।

প্রদীপ যেন অকস্মাৎ কি এক পরম সত্য স্মরণীয় একটু স্মৃতির স্বাদ পেয়েছে। সারা মন অজানা সুরে গুণ গুণিয়ে ওঠে বিচিত্র সুরে।

শীলা একবার প্রদীপের মুখের দিকে চাইল, কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, বললো না কথাটা। দু-জনে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চলে।

কেমন যেন অপূর্ব একটি সন্ধ্যা।

ময়দানের গাছ-গাছালির মাথায় গাঢ় আবীরের আভা, মেঘে মেঘে শেষ সূর্যের ঘন আরক্তিম আবেশ। পাখীর কলরবে ভরে উঠেছে চারিদিক। এক একবার গাছের ডালে বসছে তারা দু-একটা চারিদিক থেকে এসে বসছে। হঠাৎ কি যেন কলরব করে উড়ে ওঠে, আবার শান্ত হয়ে এ ডাল ও ডালে বসে। মাঠের জনতাও কমে আসছে।

প্রদীপ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওই দিকে।

তার গ্রামে শালমহুয়ার বনের প্রান্তে লাল গেরুয়া ডাঙায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নিশ্চুপ নিঝুম হয়ে আসে চারিদিক! এমনি লাল আকাশ ক্রমশঃ কালো হয়ে আসছে, জনহীন প্রান্তরে নামল সন্ধ্যার গাঢ় আঁধার। একক বসে আছে সে; কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ শীলার ডাকে চমকে ওঠে—কি ভাবছেন এত?

—ও। অপ্রস্তুত হয়ে যেন আবার এ জগতে ফিরে এল প্রদীপ। সে বলে ওঠে—দেশের কথা ভাবছিলাম। আমাদের বনে এখন সন্ধ্যা নামছে। সেই সন্ধ্যা কত সুন্দর। কত মনোরম। এখানে সব যেন হুড়মুড়িয়ে চলে; দেখবার অবকাশও নেই ওর দিকে চেয়ে।

শীলাই চায়ের পট থেকে লিকার ঢেলে চিনি দুধ মিশিয়ে এগিয়ে দেয় ওর দিকে।

—নিন আপাততঃ চা-টা যে জুড়িয়ে গেল।

—হ্যাঁ।

আনমনা হয়ে চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

শীলা অবাক হয়ে ওই আপনভোলা ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে। কত সহজ সরল সুন্দর মনে হয়। শহরের ছেলেদেরও দেখেছে। কথার জাহাজ তারা, সবজান্তা।

কেবল বলেই যাবে সাত-সতেরো। এ যেন সেই মেকি মুখোস পরা ছেলেদের দলের নাম নয়। প্রশ্ন করে শীলা—

—এখানে আপনার ভাল লাগে না নয়?

ওর দিকে মুখ তুলে চাইল প্রদীপ—চুপ করে থেকে জবাব দেয়।

—বড় একা একা লাগে। মনে হয় আমি যেন কোন্ ভিনদেশে এসে হারিয়ে গেছি। নিজেকে খুঁজেই ফিরছি।

শীলার চোখেও ভেসে ওঠে শৈশবের একটি ছবি। কেমন যেন ছায়াঘন শান্তিময় সেই দেশ। সন্ধ্যার আকাশে দপ্ দপ্ করে জ্বলতো তারার আলো, ভেসে আসতো বন থেকে শিয়ালের ডাক, তারই মাঝে শীলা এইটুকু ছোট্ট মেয়েটিও যেন হারিয়ে যেত।

—আপনার দেশ অতি আবছা মনে পড়ে। আমার চমৎকার লাগতো।

ওর দিকে প্রশংসদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে প্রদীপ।

রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। চারিদিকের আঁধার আলোয় দূর

হয়ে গেছে। গাড়িগুলো ছুটে চলেছে। শীলাই উঠে পড়ে—ইস্‌ রাত হয়ে গেছে। ওদিকে আপনার পড়ার ক্ষতি হবে।

—না। বেশ ভালোই কাটলো আজকের সন্ধ্যাটা।

শীলা ওরদিকে একবার চেয়ে মাথা নামালো, ওর চোখে কেমন সলজ্জ মধুর একটু চাহনি।

দু-জনে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে যায়।

সারামনে কি যেন একটি মিষ্টি আবেশ ফুটে ওঠে প্রদীপের।

কোথায় বনের আড়ালে যেন প্রথম বর্ষার জল পেয়ে কুরুবক ফুল ফুটেছে। তার অস্তিত্ব জানা যায় না—তবু বনের বাতাস মাতাল করে রেখেছে তার মৃদু সৌরভে।

সারা মনে তেমনি যেন একটু অনুভূতি ওর। শীলার সেই চাহনি মনে পড়ে কেমন যেন অন্ধকারে আনে তৃপ্তির আবেশ।

শীলাও পথ চলতে চলতে কেমন থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম মনের মাঝে ওঠে অপরূপ একটি সুর। তার প্রতিটি দিনের কাজে আজ সেই সুরের অনুরণন। প্রদীপকে মনে হয় তার বহুকালের চেনা জানা। ও তার মনে এই ইঁট কাঠ লোহার আবেষ্টনী-ঘেরা শহরের বন্দীপুরে আনে সবুজের স্বপ্ন। ও যেন রক্তকরবীর নন্দিতা—তার কিশোরকে খুঁজে ফিরছে এই লৌহনগরীর মাঝে।

—সারাদিন কোন্‌দিকে কেটে যায়, জানে না। আবার বৈকাল নামে। পায়ে পায়ে কলেজ থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলে।

—তুমি!

এগিয়ে আসে প্রদীপ। কলরব করে ছেলেরা চলেছে। তার মধ্যে প্রদীপ যেন একা। ওকে দেখে এগিয়ে আসে শীলা।

বলে ওঠে—ভাবলাম দেখা করে যাই।

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত প্রদীপ ওর দিকে চেয়ে থাকে। শীলা বলে ওঠে—আজ কিন্তু আমি চা খাওয়াবো। চল এখান থেকে—ওরা হাঁ করে কি দেখছে।

প্রদীপের চমক ভাঙে, দু-জনে এগিয়ে যায় পায়ে-পায়ে।

গঙ্গার বুকে সন্ধ্যা নামছে। ইডেন গার্ডেনের গাছ-গাছালির মাথায় ঘন অন্ধকার। দু-একটা তারা শান্ত নিথর ঝিলের বুকে দোল খায়।

শীলা বলে ওঠে—মাকে খুব ভালবাসেন না ?

প্রদীপ জবাব দেয় না, ওর দিকে মুখ তুলে চাইল। মাকে সত্যিই ভালবাসে সে। মা সারা জীবন মুখ বুজেই রইল। বাবার মত কঠিন একটি লোককেও শ্রদ্ধা করেছে।

—হ্যাঁ। ছোট্ট জবাব দেয় প্রদীপ যে মেয়েরা সব সইতে পারে তাদের আমি শ্রদ্ধা করি।

শীলা চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। নিজের সহজ সত্তাকে ঘিরে রয়েছে একটি ব্যক্তিত্ব, যেটা সহজে ধরা পড়ে না।

—আপনি বড় কম কথা বলেন ?

—বলবার কি আছে এত জানি না। হাসে প্রদীপ।

শীলার হাতখানা হঠাৎ যেন অজানাতেই ওর হাতে এসে ঠেকে, সারা শরীরের তন্ত্রীতে নীরব ঝড় বয়ে চলে। বেদনার্ত চোখ মেলে চাইল প্রদীপ ওর দিকে, নিবিড় আঁধারে সবাই যেন হারিয়ে গেছে, জেগে আছে মাত্র ওরা দু-জন। শন শন বাতাস বয়।

শীলা বলে ওঠে—কেমন যেন সারাটা দিন চেয়ে থাকি কখন বৈকাল হবে।

প্রদীপের মনেও ঝড় উঠেছে। কেমন যেন সব বাঁধন ছেঁড়ার ঝড়। উঠে পড়ে, বলে, চল রাত্রি হয়েছে।

শীলা হাসে—মা তো কালই খোঁজ করছিল কোথায় গিয়েছিল। আজও পথ চেয়ে থাকবে।

প্রদীপ ওর দুষ্টুমি হাসিটুকুকে যেন মিষ্টি করে পায়। বাগানের বাইরে বের হয়ে আসে তারা।

প্রদীপের সেদিন হোস্টেলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়; একটি

মনোরম সন্ধ্যা। ট্যাক্সিতে করে ওকে পৌঁছে দিয়ে ফিরছে হোস্টেলে জনহীন রাস্তায় মিটমিট করে জ্বলছে গ্যাসবাতি, এপাশে সিনেটের বড় হল অন্যদিকে বড় বাড়িখানা। দিনের বেলায় ছেলেদের কোলাহলে ভর্তি থাকে, রাতের অন্ধকারে নিঝুম হয়ে গেছে। কেমন যেন মনে হয় প্রদীপের। কালীপুরের জনহীন রাস্তা দিয়ে চলেছে সে একা, আমবাগানে এই সময় ওঠে ঝরা-বোলের সৌরভ, শালবন থেকে মহুয়ার সুবাস-মাখা বাতাস মনে আনে কি এক সুরের পরশ—হারানো সেই জীবন ফিরে পায় সে শীলার সান্নিধ্যে এসে। মধুর স্বপ্নভরা সেই দিন।

বসন্ত পড়ছিল, ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। প্রদীপ জামা গেঞ্জি খুলে ওর খাটে এসে বসে গুন গুন করে একটা সুর ভাঁজছে।

বসন্ত প্রশ্ন করে—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

হাতের কয়েকখানা নতুন বই টেবিলে রেখে বলে—এরই সন্ধানে।

বসন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে, কি যেন চেপে যাচ্ছে তার কাছে প্রদীপ।

—শুধু কি তাই?

শেষকালে জেরার চোটে বলে ফেলে প্রদীপ আজকের সন্ধ্যার সেই সঙ্গটুকুর কথা; কি যেন এক পরম সম্পদ—নিঃশেষে একা তারিয়ে তারিয়ে সেই স্মৃতিটুকু অনুভব করতে চায়, বসন্ত যেন তাতেই বাদ সাধতে বসেছে। সবকিছু শুনে কোন কথা বলে না বসন্ত, বইখানা টেনে নিয়ে বসে। প্রদীপই বলে ওঠে—কথা বলছিস না যে?

বসন্ত ফস্ করে জবাব দেয় কঠিন স্বরে,—ওসব করবার মত অর্থ সামর্থ্য নেই, সাহস তো দূরের কথা। তাই আলোচনা নাই বা করলাম। তোদের শরীরে জমিদারীর নীলরক্ত বইছে—ওটা তোদের চাই-ই।

প্রদীপ কথাটা শুনে চমকে উঠে, বসন্তর দিকে চাইল। বসন্ত

একটা হীন জঘন্য মন্তব্য করবে ভাবতে পারেনি প্রদীপ। রাগটা মনে মনেই গুমরাতে থাকে।

প্রদীপ একটু চটে ওঠে এই ইঙ্গিতে। বসন্ত মনে মনে কোথায় তাকে ঘৃণা করে—আজ মনের সেই চাপা ঘৃণা ফুটে ওঠে ওর কথার সুরে। কি কড়া জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। মনে হয় ওকে যেন হিংসা করছে বসন্ত, বইগুলো খুলে নাড়াচাড়া করতে থাকে। পড়ায় মন বসে না, মনটা কেমন খিঁচড়ে যায়। বসন্ত মুখ গোঁজ করে পড়ছে। প্রদীপ কলমটা বন্ধ করে কি ভাবছে। কোন্ দূরে মন চলে যায়।

কেমন লাল মাটির প্রান্তরের শেষে ঘন সবুজ আর হলুদে মেশা বনভূমি। পাখীর ডাকে ভরপুর। বাতাসে ঝরা মহুয়া ফুলের সৌরভ।

হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পায় গাছের ডালটা বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে জানলার গায়ে, ওর মরা ডালে একরাশ হলদে সোঁদাল ফুলের স্তবক। বাতাসে ঝরে ঝরে পড়ছে।

কে যেন ওকে ডাকতে এসে কাঁচের শার্সিতে মাথা খুঁড়ে ফিরে যাচ্ছে। বই রেখে উঠে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। শ্রান্ত-ক্লান্ত মহানগরী। অন্ধকারের বুকে স্তরে স্তরে আলোকমালা-পরা শহর; রাতের বাতাস দেওদার গাছের পাতায় উতলা ঝড় আনে—হু-হু রাতজাগা ঝড়। মন কেমন করে। বহুদিন বাড়ি যায়নি প্রদীপ, মায়ের কথা মনে পড়ে বার বার। বইগুলো গুছোতে থাকে। বসন্ত কথা বলে না—ওর দিকে চেয়ে থাকে।

ক-দিনের ছুটিতে বাড়ি ঘুরে আসবে একবার প্রদীপ। চাকরটাকে ডেকে খবর দিয়ে, সুপারের অফিসের দিকে এগিয়ে গেল পারমিশানের জন্য। আজই বের হয়ে পড়বে। বসন্ত বই-এ মন দেবার চেষ্টা করে।

রাত্রের ট্রেন; হাটকুড়োনো শেষ প্যাসেঞ্জার। এ-স্টেশন ও-স্টেশনের শেষ যাত্রিদলকে যেন ঝেঁটিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে

চলেছে ঢিমে তালে গদাইলস্করী চলে। চুপ করে বসে আছে প্রদীপ ; সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটের যাত্রী নয় সে—ইচ্ছে করেই থার্ড ক্লাসে চলেছে। তাছাড়া অনুমান করতে পারে কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল ঘটেছে—নইলে প্রথম প্রথম বাড়ি থেকে টাকা আসতো যে সময়ে এখন ঠিক সেই সময়ে টাকাটা পৌঁছোয় না, যদি বা আসে হপ্তাখানেক পর—তাও আগেকার সেই অঙ্ক নয়, আরও কম। তবে কমে গিয়েও যেটুকু আসে তাতে তার অসুবিধা হয় না। বাইরে বের হয়ে জমিদারবাড়ির সেই আমিরী চালটাকে ভুলে গেছে সে। অতল অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটা চলেছে ; নিজেকে যেন ফিরে পায় সে। আসবার সময় বসন্তকে জানিয়েও আসেনি। বসন্তের কথায় এখন আর রাগ হয় না—জমিদারনন্দন বলে বিশেষ কোন শ্রেণীর সে নয়, একথাটা মনে মনে নিজেই বিশ্বাস করে সে ; তাই ওর কথায় রাগ আর করে না। তবু শীলার প্রসঙ্গে ওর ওই চাপা ইঙ্গিতটার কথা মনে পড়লেই কেমন যেন মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শীলার সম্বন্ধে ওই ধারণা তার কোন দিনই নেই। বসন্তকে তাই ক্ষমা করতে পারেনি।

বাইরের আকাশে মিটিমিটি তারা জ্বলছে দু-একটা চারিদিক রাত্রির আঁধারে সুপ্তিমগ্ন।

—কোন্‌সে টিশন বা ?

চাদর মুড়ি দেওয়া দেহাতী কোন কুলি ঠেট ভাষায় প্রশ্ন করে। গায়ের চামচিকিনি চাদরের গন্ধ ; টিকিট কালেক্টারকে দেখে এতক্ষণ বেঞ্চির নিচে লুকিয়ে ছিল—সে নেমে যেতে এখন বের হয়ে এসে নোংরা মেজেতে বসেছে।

—কাঁহা যায়েগা ? প্রশ্ন করে প্রদীপ।

লোকটা জবাব দেয়—কিউল।

কিউল পর্যন্ত বিনা টিকিটে এমনি লুকিয়ে পালিয়ে যেতে হবে তাকে, ধরা পড়লেই নামিয়ে দেবে। কোথাও কোন জনমানবহীন স্টেশনে পড়ে থাকবে আঁধার রাত্রে, পরের ট্রেনের অপেক্ষায়।

—মা কা বেমারি বাবু, পয়সা নেহি হ্যায় কেরায়া দেগা কেইসে? ক্যা মালুম কব পেঁাছেগা।

প্রদীপই পকেট থেকে ওকে গোটা দশ টাকা বের করে দেয়।

—টিকিট কর লেও।

লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে, ঠিক যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

—লেও। প্রদীপ তার হাতে নোটখানা ধরিয়ে দিল। অনেকেই অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে ওর দিকে।

রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন তন্দ্রামত এসেছিল জানে না, হঠাৎ কি একটা স্টেশনে চটকা ভাঙতেই জেগে ওঠে, ভোররাত্রির জমাট অন্ধকারে কিছু বিশেষ দেখা যায় না, জনহীন সুপ্তিমগ্ন স্টেশন—কোন্ সুদূরে এসে পড়েছে সে।

—রাজবাঁধ! স্টেশনের পোর্টারের ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে প্রদীপ—এর পরই তাদের স্টেশন।—গাড়ি চলতে শুরু করেছে। জানলা দিয়ে পরিচিত সেই আধমজা বিরাট দীঘিটা দেখা যায়; তাদেরই পত্তনি ছিল; বহুবার বালিহাস মারতে এসেছে ওই দীঘিতে শীতের মুখ-আঁধারি ভোরে।

কেমন যেন বাড়ির কাছে পেঁাছে গেছে সে। ওই প্রান্তর, গাছগাছালি, উঁচু-নিচু ক্ষেত তার চেনা।

গাড়িখানা ছুটে চলেছে। দু-পাশে মাটির রূপ বদলায়, তারার আলোয় দেখা যায় কাছিমের পিঠের মত ডাঙা; দূরে শাল পলাশের বন আঁধারে ডুবে রয়েছে। এমনি অন্ধকার নির্জন কালীপুর স্টেশনে ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে। এসময় বনের ধারের পথ দিয়ে চলা নিরাপদ নয়। স্টেশনের প্রায়ান্ধকার প্ল্যাটফরমে বসে মশা তাড়াতে হবে যতক্ষণ না ভোরের আলো ফুটে ওঠে। তারপর বাড়ি পেঁাছবে।

ট্রেনখানা বাঁক ঘুরতেই অবাক হয়ে যায় প্রদীপ। উঁচু ডাঙা

আর শালবনসীমায় আলো আর আলোর মেলা ; বিজলীর আলোয় অন্ধকার ডাঙা আর শালবনসীমায় আলো—আলোর মেলা। বিজলীর আলোয় অন্ধকার ডাঙা উল্লসে উঠেছে, নদীর বুকে জ্বলছে বড় বড় সার্চ-লাইট, কালীপুরের আদিম অন্ধকার কোন্ দিকে হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে গহন বনসীমা। কি যেন দক্ষযজ্ঞের আয়োজন চলেছে সেখানে। আলো আর আলো।

এ কি সত্যিই কালীপুর—না ঘুমের ঘোরে অন্য কোন জায়গায় চলে এসেছে সে। না—কেমার কোম্পানির সেই মাটিকাটা খাদটা দেখা যায় ; তাদের গ্রামের দিকে জ্বলছে মাঝে মাঝে সার্চলাইট কয়েকটা ; আকাশ-বাতাস বুলডোজার, কন্‌ক্রিট মিকশ্চার, মেসিনের গর্জনে ভরে উঠেছে।

তেলের বাতি আর নেই, কালীপুর প্ল্যাটফরমে জ্বলছে বিজলীর আলো। নতুন এক কালীপুরের কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর প্ল্যাটফরমে পা দিল অতীতের একটি মানুষ—প্রদীপ। আজ বাল্যের সেই কালীপুরকে চিনতে পারে না। নেহাত অপরিচিতের মতই ভিড়ে মিশে নামল এদিকের নতুন উঁচু প্ল্যাটফরমে ; ওভারব্রিজও উঠেছে নতুন।

ব্রিজের ধারে দাঁড়ান টিকিটবাবুকে টিকিটখানা জমা দিয়ে ভিড়ের মাঝে উঠে গেল উপরে ; কেউ অভ্যর্থনা করতে দাঁড়িয়ে নেই ; কেউ সেলাম—গড়ও করে না। পাঞ্জাবী—মাদ্রাজী—গুজরাঠী—বাঙালী যাত্রীর ভিড়ে মিশে এধারের প্ল্যাটফরমের চাতালে এসে দাঁড়াল।

মাথার উপর কয়েকটা ফ্যানও ঘুরছে ; ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের দরজা বন্ধ ; যখন-তখন যাকে-তাকে খুলে দেবার হুকুম নেই—বন্দীপুরের বাবুরা যেন এখানে এসে হারিয়ে গেছে। মুড়ি মিছরির একদর।

প্ল্যাটফরম নানাজাতীয় লোকের ভিড়ে ভর্তি ; ওদিকে হয়েছে নতুন শেড তুলে চায়ের স্টল। সামনেই বড় বড় টবে কয়েকটা

ঝাউ—পাম—পাতাবাহার গাছ রাখা ; কঠিন কাঁকর মাটিতে পোঁতা হয়েছে কি সব গাছের চারা।

বছর খানেক আগেই ওদিকে নোতুন শেড উঠছে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মুসাফির খানা। রাতের অন্ধকার কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। চায়ের স্টলেও লোক জমেছে এই রাত্রে।

রাতের অন্ধকারে নদীর দিক থেকে ভেসে আসত গাংচিল, কাদাখোঁচা পাখীর ডাক—শূন্যে মিলিয়ে যেত সেই ডাকগুলো—তি-তি-তি।

রাতের ট্রেন চলে যাবার পর প্ল্যাটফরম ইস্টিসান জনমানব হীন হয়ে পড়তো। জেগে থাকতো ইস্টিসান মাস্টার আর দু-একজন খালাসীতেই আলো নেভাতো প্ল্যাটফরমে।

অন্ধকার প্ল্যাটফরম দু-চারজন যাত্রী জড়াজড়ি করে বসে থাকত, মুখে-চোখে তাদের জমাট ভয়ের ছায়া, যে কোন মুহূর্তে বন থেকে বাঘ নামবে, না হয় রাতের অন্ধকারে আসবে ডাকাতের দল—ধনে-প্রাণে মেরে যাবে।

আর আজ। আজ সেখানে অতি আধুনিক কায়দায় হাঁটুর নিচেই প্যান্ট গুটিয়ে রংবেরং-এর হাওয়াই সার্ট গায়ে দিয়ে কারা হিন্দী গানের সুর ভাঁজে। আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে ক্যাটারপিলার—ট্রাক্টর—বুলডোজার—ভারী ড্রিলের ক্রুদ্ধ গর্জনে। মাঝে মাঝে হেডলাইট জ্বেলে জিপগুলো ছুটোছুটি করে এদিকে ওদিকে—যেন জ্বলন্ত চোখ মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাতের আঁধারে কালীপুরের বুকে কোন দৈত্যের দল।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রদীপ এই বিরাট পরিবর্তনের স্রোতোধারার পাশে। ঠিক চিনতে পারে না। অপরিচিত নতুন লোকের মত তাই দেখছে দূর থেকে।

নতুন করে দামোদরে বাঁধ দিয়ে ইরিগেশন ক্যানেল তৈরী হবে, ওপারের বিস্তৃত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা হলে ধান চাল

চালান আসবে। এদিকে বনভূমি-ডাঙায় গড়ে উঠবে এ যুগের প্রধান প্রধান কারখানা। তারই ভিতপত্তন হয়ে গেছে, পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে।

প্লাবন নামছে কালীপুরে—এ যুগের সভ্যতার ঢল; যন্ত্রযুগের রাজধানী গড়ে উঠবে এই বন্ধ্যা আদিম অরণ্যের মাঝে। মানুষ তাই এসে জমেছে দিক-দিগন্তর থেকে।

পুবদিক ফরসা হয়ে গেছে; আকাশের মাথায় দু-একটা তারা তখনও যাই যাই করে যায়নি। স্টেশনের বাইরে ঝাঁকড়া বটগাছের মাথায় পাখ-পাখালির ঐক্যতান শুরু হয়ে গেছে। লোকজন কলরব চায়ের দোকানে।

স্টেশন থেকে বের হয়ে এল প্রদীপ; ভোরের আবছা আলোতেই এই পথটুকু পার হয়ে গিয়ে বাড়ি ঢুকবে। চোখেমুখে রাত্রিজাগরণের চিহ্ন, মাথার চুলগুলো উস্কখুস্ক, পাঞ্জাবির ইস্ত্রিও লাট হয়ে গেছে। এ অবস্থায় বন্দীপুরের বাবুদের কাউকে কেউ দেখেনি বিশেষ এই কালীপুর বাজারে। প্রদীপ তাই অচেনার মতই চলেছে।

খোয়ারাস্তার বদলে পিচঢালা রাস্তা গড়ে উঠেছে। চওড়া রাস্তার দু-দিকে নতুন দোকান। সেই হামাগুড়ি দিয়ে নুইয়ে পড়া দোকান—সামনে আভ্যিকালের দু-একটা নড়বড়ে বেঞ্চি, টিনের চেয়ার কোন্ দিকে হারিয়ে গেছে।—হারিয়ে গেছে সেই দিনের চাষাভূষা খদ্দেররাও। দোকানের আসবাবপত্রও আলাদা। লোকজন খদ্দের-পত্রও আজ বদলে গেছে ফ্যাক্টারির কল্যাণে, জমজমাট দোকান পসার। ভিতরে পথে এরই মধ্যে ট্রাক সাইকেল রিক্সাগুলো বের হয়েছে। তাদের হর্নের শব্দে জেগে উঠেছে কালীপুর রাতের ঘুম থেকে। দেখা যায় আমদানী হয়েছে শ্বেতপাথরের টেবিল—কাঠের বার্নিশ-করা চেয়ারের; সকালে আঁচ পড়েছে তাদের উনুনে।

দোকানের উপরে রকমারি সাইনবোর্ড, মাথার উপর দিয়ে চলেছে

হাই-পাওয়ার ইলেকট্রিক লাইন। কালীপুরের পিচঢালা রাস্তা দিয়ে চলেছে প্রদীপ। কোন পথে অচেনা লোকের ভিড়ও কম নয়।

—এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অপিসটা কোন্ দিকে দাদা ?

কার ডাকে ফিরে চাইল প্রদীপ, কাল রাত্রে প্ল্যাটফরমে দেখা একটি ছেলে। এর মধ্যেই স্টেশনের কলে মাথা ধুয়ে, বুকপকেট থেকে ক্লিপআঁটা চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আসছে, কাঁধে ঝুলছে একটা সাইডব্যাগ। এদিক ওদিককার বাড়িগুলোয় কিসের সন্ধান করছে।

—ঠিক জানি না। প্রদীপ জবাব দেয়।

ছেলেটি অবাক হয়ে যায় ওর এই অজ্ঞতায়। এখানে চাকরির চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন দরকারে কেউ আসতে পারে জানতো না!

বিক্রমনারায়ণ আগেই টের পেয়েছিল এই যুগ-পরিবর্তনের। অনুমান করেছিল ভালোটিয়া-নবনী মিত্রের দল। নটবর ঝড়ের আগে উড়ে যাওয়া খড়কুটো; কখনও এ-দিক কখনও, ও-দিক করে ঠিক টিকে থাকে ; হাওয়ায় ভর করে আসমানেই থাকে—মাটিতে পড়ে না। তাই সেও ভেসে চলেছে এই স্রোতে। হারিয়ে যায়নি।

সেদিনের ঘটনাটা আজও ভোলেনি নটবর ; প্রতাপনারায়ণ যে শক্তির বলে তাকে সেদিন প্রকাশ্যে কুকুরের মত অপমান করেছিল সেই শক্তি আজ নিঃশেষে হারিয়েছে ওরা। জমিদারি উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পরিণত হয়েছে একটা ধ্বংসস্তূপে। যারা সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও বদলে নিতে পেরেছে টিকে আছে, তারাই টিকে থাকবে। বিক্রমনারায়ণ তাই পেরেছে।

বাইরের ব্যবসা তার ফেঁপে উঠেছে। জমিদারি বাজেয়াপ্তের নোটিশ পাবার আগে থেকে যা যেখানে পেরেছে টাকা দু-হাতে ঘরে তুলেছে। সামান্য মাত্র প্রতাপকে দিয়েছে বিষয় হস্তান্তর করতে। নকড়া-ছকড়ায় বন্দোবস্ত দিতে শুরু করে যাকে-তাকে নোটিশ হয়ে

যাবার পরও থামেনি। প্রতাপ অবাক হয়ে যায় এই ব্যাপারে। বিক্রম মরিয়া হয়ে সবকিছু বন্দোবস্থ করে চলেছে।

—এসব কি করছেন আপনি? প্রতাপ বাধা দেয়।

বিক্রমের কথার উত্তর দেবার পর্যন্ত সময় যেন নেই। কাছারিবাড়িতে লোক গিশ-গিশ করছে। ওসব বাজে মায়া তার নেই। বিষয় সবই যাবে, আজ নাহলে কালও যাবে। তাই আগে থেকেই যা টাকা পায় তারই বিনিময়ে সে সবকিছু বিষয়-পত্তনি, না-লাট বন্দোবস্ত করে বসেছে। দূরদূরান্তর থেকে লোক আসছে। খবর পেয়েছে বন্দীপুরের বাবুদের সম্পত্তি যেন উড়ই হচ্ছে।

খাস লাখোরাজ মৌরসীপাট্টার জমি। সোনা ফলে তাতে। তাই পাবার আশায় তারা হাজির হয়েছে। জমি যেন লুটচ্ছে।

হচ্ছেও তাই। বিক্রমনারায়ণ কাছারিতে বসেই সম্পত্তি লাটে তুলেছে। নায়েব-গোমস্তারা বসে রোকড় পড়চা নিয়ে। কলরব উঠছে।

—মৌজা ঘনশ্যামপুর, তৌজি নম্বর বাইশ, রেঃ সাঃ নম্বর দশ—খতিয়ান নম্বর বাহাত্তুর—দাগ নম্বর অমুক, অমুক, অমুক। জমির রকম সোল একত্রে সাত একর আঠারো শতক....

ঘনশ্যামপুর থেকে আশপাশের গ্রাম থেকে এসেছে চাল চিঁড়ে বেঁধে প্রজাপাটকের দল, কোমরের গেঁজটায় নোটের তাড়া। একচকে বিশ-বাইশ বিঘে সোলজমি—আকাল-পোষ-জমি, ডাকলে সাড়া দেয়। প্রজার দল দর হাঁকে,

—বিঘেকরা ছুশো টাকা নজরানা।

দর ওঠে—তিনশো।

ঘনশ্যামপুরের পতিতপাবন শেষ দাম দেয়—সাড়ে তিনশো।

তার নামেই পিছনের তারিখ সন দিয়ে বন্দোবস্থ হয়ে গেল। ছু-হাতে আসছে টাকা, প্রতাপনারায়ণ দেখছে। বিক্রমনারায়ণ সেই টাকা থেকে বেশ কিছু সরিয়ে ফেলে চালান করে দেয় আসানসোলের গদিতে না হয় রানীগঞ্জের ব্যাঙ্কে।

সেদিন প্রতাপ বের হচ্ছে বারবাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপে—বাড়ির দেউড়ির কাছে গাছতলায় জমেছে ওরা ; সকলের চোখে সম্পত্তি কেনবার স্বপ্ন। তাই নিয়ে যেন ঝটাপটি বেধে গেছে।

ওকে দেখে ফিরেও চাইল না কেউ, ঘাসের উপর গাছতলায় একটা পুরোনো পরচা-ম্যাপ বার করে নিবিষ্টমনে দাগ নম্বর খুঁজছে ওরা। আর রাজা-প্রজায় সম্বন্ধ রইল কি যে উঠে গেল ব্যস্ত হয়ে গড় করবে। এখন ফেল কড়ি মাখো তেল। তাই প্রতাপকেও পরোয়া করে না, আজ।

প্রতাপ-বিক্রম আজ ওদের কাছে কওলাদার মাত্র, টাকা দিয়ে ওরা ওদের সম্পত্তি কিনছে। এছাড়া মাথা নিচু করার কোন সম্বন্ধ আর নেই।

চুপ করে বের হয়ে গেল প্রতাপনারায়ণ ; চারিদিকের জমি—বন—বাগান সব গেছে কারখানার জোর দখলে। দূরদূরান্তরের মাটি থেকেও তাদের নাম নিঃশেষে মুছে যাবে, নতুন সেটেলমেণ্টেও ফৌত হয়ে যাবে চৌধুরীবংশ।

ক-দিনেই কাছারির কোলাহল থেমে যায়, লুণ্ঠনপর্ব শেষ করে ডাকাতের দল যেন উধাও হয়েছে। কয়েক পুরুষের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত বিষয়ের স্তূপ—বিক্রমনারায়ণ কয়েকদিনের মধ্যেই নিঃশেষে ফুঁকে দিল। জমি বাড়ি মহাল বাগান শালবন খাসদখলী দিঘী পর্যন্ত। পড়ে আছে জনহীন প্রকাণ্ড বাড়িটা। দেউড়ির মাথায় টিমটিম করে জ্বলে একটা বাতি। সন্ধ্যার পরই তো নিভে যায় তেলের অভাবে। কাছাড়িবাড়ির ঘরগুলো শূন্য প্রায় ; আমলা-ফৈলারা এখান থেকে বাতিল হয়ে চাকরির সন্ধান করছে, লোহা কারখানায় না হয় সরকারী জমিদারী অফিসে। তালাবন্ধ ঘরগুলোয় আরসুলা-কবুতরেরা বাসা বেঁধেছে। বারান্দায় জমে উঠেছে এক আস্তরণ ধুলো। হঠাৎ বিক্রমকে ঢুকতে দেখে পায়রাগুলো ঝটপট করে সরে গেল।

প্রতাপনারায়ণ চুপ করে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে ; স্তব্ধ দুপুরে কাছারিবাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, বহুদিন পর মিলেছে ওর অখণ্ড ছুটি—অবসর। কোন কিছু করার আর নেই তাদের।

এতদিন একমুহূর্তও বিশ্রাম পায়নি ওরা। লোকজনের হাঁক-ডাক, পাইকদের গর্জন আর প্রজার কান্নার সুর এখনও যেন ওর বাতাসে মুছে যায়নি। আজকের দিনে ওর কোন প্রয়োজন আর নেই। তাই পড়ে আছে পরিত্যক্তের মত।

বিক্রমনারায়ণ এ বাড়ি ছেড়ে কালীপুরের কাছারিবাড়িটাকে নতুন করে গড়ে তুলেছে—উঠেছে সেইখানেই। পারেনি যেতে বিক্রমনারায়ণই। ইচ্ছে করেই যায়নি, অসীম নির্জনে পড়ে আছে। কেমন যেন একক প্রহরীর মত বিশাল এই বাড়িতে একাই রয়েছে সে, বাইরের ওই চাঞ্চল্যকর জীবনকে এড়িয়ে।

হাঁফিয়ে ওঠে সীতা, স্বামীর দিকে চেয়ে সেও যেন ভয় পেয়েছে। সদাহাস্যময় সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ মানুষটি কেমন যেন বদলে গেছে ; অন্তরের মাঝে কি একটা বেদনা তার গুমরে ওঠে। ক-দিনেই মাথার চুলে ধরেছে সাদা রং—কানের কাছে কপালের উপর চুলগুলো পেকে উঠেছে। গালে পড়েছে কুঞ্চনরেখা ; চোখের কোলে কি যেন কালির ছাপ।

—দিনকতক চলো না বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।

স্ত্রীর কথায় ওর দিকে মুখ তুলে চাইল প্রতাপনারায়ণ, হাসির ম্লান আভা ফুটে ওঠে ওর মুখে, বলে ওঠে—

—কেন, বেশ তো আছি। কোন কাজ নেই—কেবল বিশ্রাম আর ছুটি।

—ছাই!

সীতা এই জীবনকে মেনে নিতে পারে না। দেখেছে স্বামীকে এত বছর,—কেমন যেন একটি যুগের মানুষ—যারা অন্য কোন যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না নিজেকে। তাই চুপ করে

সরে এসে নিজের চারিদিকের শক্ত খোলে আশ্রয় নেয়। নিরাপদ আশ্রয়। সীতাও মনে মনে এটাকে সহ্য করতে পারে না। বলে ওঠে—

—এমনি করে বসে না থেকে যা হয় একটা কিছু করো, তবু সময় তো কাটবে।

প্রতাপও অনেক ভেবেছে কি তার করণীয় কর্তব্য। একটি তেজস্বী স্পষ্টবাদী মানুষ, সে এই কালীপুরের চরম দুর্নীতি আর নির্লজ্জ খোসামোদ করতে অভ্যস্ত নয়, পারবে না। তাই সরে এসেছে দূরে। স্ত্রীর কথার বলে—

—মুদিখানার দোকান করবো?

সীতা কথা বলে না। স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। বুক চিরে ওঠে একটা দীর্ঘশ্বাস। কেমন যেন রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকাটা ঠিক ভাল ঠেকে না তার। প্রতাপের মত মানুষ এভাবে থাকতে পারে না—কোন দিন কোন দিকে চাপা-পড়া সেই বিক্ষোভের প্রকাশ পাবেই; ভয়ংকর সেই প্রকাশ; তাকে ভয় করে সীতা। তাই স্বামীকে অন্য কিছুর মধ্যে জড়িয়ে রাখতে চায়।

এমনি দিনে বাড়ি আসে প্রদীপ। ঠিক চিনতে পারে না যেন গ্রামখানাকে। বাগান-ছায়াঘেরা আম জাম-গাছগুলোকে কেটে ফেলেছে। উঁচু চড়াই-এর বুক থেকে মস্ত মস্ত ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর বুলডোজারগুলো পাহাড়ের মত কাঁকর মাটির স্তূপকে ঠেলে এনে চৌরস করছে। পায়ে হেঁটেই ঢুকল গ্রামে। রাস্তাঘাট সব ভেঙে চুরে নতুন কারিগরীর ব্যবস্থা চলেছে।

বাড়িটায় কয়েক বছর চুনকাম মেরামত করা হয়নি। পুরোনো আমলের বড় বাড়ি, চুনবালির আস্তরে পড়েছে কালো একটা প্রলেপ, যেন গভীর বিষাদঢাকা মূর্তি; ওপাশে চড়াই-এর গায়ে উঠেছে কারখানার নতুন কয়েকটা রিইনফোর্স কনক্রিকেটর বাড়ি,

পাশাপাশি দুটো যুগ এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এ চেয়ে আছে ওর দিকে মুখোমুখি।

দেউড়ি ফাঁকা। দারোয়ানের ঘরের দরজাটা পর্যন্ত নেই। পায়ের শব্দে একটা নেড়িকুকুর একবার কুণ্ডলী থেকে মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে আবার মাথা নামাল। ক্যামেলিয়া গাছটাই এখন দাঁড়িয়ে আছে—দাঁড়িয়ে আছে ওপাশের দুটো চাঁপা আর বকুল গাছ। গোলাপবাগিচায় জন্মেছে ঘাসের জঙ্গল। পাঁচিল ঠাঁই ঠাঁই ভেঙে পড়ছে। চুনকাম অভাবে দেওয়ালের রং কালো হয়ে উঠেছে পড়োবাড়ির মত।

শূন্যপ্রায় কাছারিবাড়ির দিকে চেয়ে একবার থমকে দাঁড়াল প্রদীপ। সবই যাবে—যাচ্ছে। এই হয়তো কালের কঠোর নিয়ম। এ বাড়ির মাটিতে—দেওয়ালে সর্বত্র সেই আধুনিক বেলশাজারের ভবিষ্যৎ ধ্বংস-অভিশাপ ফলতে শুরু হয়েছে। প্রদীপ চুপ করে কি ভাবতে ভাবতে ভাঙা সিঁড়িটা দিয়ে উপরে উঠে যায়।

—এলি!

সীতা এগিয়ে আসে ছেলেকে দেখে। মায়ের দিকে চেয়ে থাকে প্রদীপ—প্রণাম করে। না—মায়ের দেহে মনে কোথায়ও তেমন পরিবর্তন আসেনি। সীতা সহজকণ্ঠে ছেলেকে প্রশ্ন করে—

—ভালো ছিলি? শরীর খারাপ লাগছে কেন?

অবাক হয়ে সীতা দেখছে প্রদীপকে। ক-বছরেই প্রদীপের চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা ব্যক্তিত্ব। এ যেন ঠিক খুব কাছের মানুষ নয়—দূরের অন্য কোন জন।

প্রদীপ এক-বছরেই ওদের বর্তমান অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। অনুমান করেছে আজ ওই ভাঙা বাড়ির মতই তাদের সমস্ত শ্রী সৌন্দর্যও ধ্বসে পড়তে চলেছে—পথের সামিলে।

মা গরীবের ঘরের মেয়ে—এর চেয়ে অনেক বড় অভাব দারিদ্র্য সে দেখেছে তাই আজকের সর্বনাশকে সহ্য করবার মত শক্তি

তার ফুরোয়নি। এখনও সহজ ভাবেই টিকে থাকবার চেষ্টা করছে।

বাবাকে উঠে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল প্রদীপ।

ভোরে বেড়ানোর বহুকালের সেই অভ্যাসটা প্রতাপনারায়ণের এখনও যায়নি। সাদা ঘোড়াটায় করে মাইল চারেক পথ দাবড়ে গলদঘর্ম অবস্থায় এসে দেউড়িতে লাগাম সহিসের হাতে ছেড়ে উঠে আসতেন উপরে, বাবার সেই ঘর্মাক্ত বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহটার ছবি আজও প্রদীপের চোখে ভাসে—তার তুলনায় আজ এই দৃশ্য দেখে সে চমকে উঠেছে।

ঘোড়া আর নেই। একটা সাইকেলই কিনেছে প্রতাপ; কম খরচে যাতায়াত করা চলে। সাইকেলখানা নিচে নামিয়ে রেখে উঠে আসছে একটি মানুষ। চমকে উঠে প্রদীপ।

বয়সের ছাপ প্রকট হয়ে উঠেছে সারা দেহমনে—চোখের কোলে। সেই মানুষটি যেন কি এক ঝড়েভাঙা গাছের মত কোথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। ওর দুমড়ে পড়া ডালপালা থেকে আশ্রিত পাখীগুলোও উড়ে গেছে। একা সে।

প্রদীপের দিকে চেয়ে আছে প্রতাপনারায়ণ। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা; চোখে মুখে বুদ্ধি প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি। দুই যুগের দুটি ভিন্ন সত্তা।

আশা হয়—হ্যাঁ, হাসির আভা ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে প্রতাপের মুখে। সীতা ওদের দু-জনের দিকে চেয়ে থাকে।

শালবনসীমায় নদীর বালিয়াড়ি রাঙিয়ে তুলে সূর্য উঠছে—প্রভাতের রক্তলাল সূর্য।

প্রতাপ কথা বলে না এই নবচেতনাকে যেন প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হয়েছে সে।

শীলার মনে যেন কি একটা সুর বাজে। অকারণেই ভালো

লাগে সব কিছু, নিজেকে। প্রদীপের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই তার দিন মুহূর্তগুলো কেমন স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে চলেছে নিজেই টের পায় না। চারি পাশেই সব কিছুরই রূপ রং বদলে গেছে।

ক-দিন যেন আর শীলার কাটতে চায় না। কাজে মন বসে না। ওর গানও থেমে গেছে। সকাল থেকে উঠে বই নিয়ে বসে আবার বই ফেলে উঠে পড়ে। মাও বলে কি হয়েছে তোর বল দিকি। পড়া-শোনায় মন নেই।

শরীরটা ভাল নেই। এড়িয়ে যায় শীলা।

কি করে বলবে রোজকার বৈকাল-সন্ধ্যা তার জীবনে যে সুর এনেছিল ক-দিন তা আর বাজে না।

প্রদীপ বাড়িতে গেছে কি জরুরী কাজে। শীলার মনে হয় কোথায় যেন একটা নিবিড় বাঁধনে সে জড়িয়ে পড়েছে। মনের এই প্রথম ব্যাকুলতায় সেও অধীর হয়ে উঠেছে। রাগ হয়—ফিরে এলে কথাই বলবে না।

ক-দিন কেটে যায় এমনি ভাবে। হঠাৎ সেদিন পথে দেখা। প্রদীপ ক-দিন পর বাড়ি থেকে ফিরেছে। কি যেন পরিবর্তন এসেছে তার মনে। বাড়ির অবস্থা, বাবার অবস্থাও দেখে এসেছে। বেশ বুঝেছে একটা ভাঙনের ঝড় এগিয়ে আসছে। এ ঝড় ঠেকাবার ক্ষমতা কারোও নেই। ভেঙে পড়ছে তাদের ঘর।

কেমন যেন সব হারানোর নীরব ব্যথা তার মনে মুখে তারই প্রকাশ। নিজেকে আরও দুর্বল মনে হয় প্রদীপের।

হঠাৎ শীলার ডাকে ওর দিকে চাইল। এগিয়ে এসেছে শীলা। স্বাস্থ্য যৌবন আর রূপের আভাসে ঝলমল কোন সত্তা। কি এক সম্পদে ভাগ্যবতী।

শীলা বলে ওঠে—শরীর খারাপ?

—না।

প্রদীপের মনের কথাগুলো যেন ঠেলে আসে। কাউকে শোনান

দরকার যে বুঝবে তাকে সমবেদনা জানাবে। আজ শীলাকে তাই যেন তার প্রয়োজন।

শীলাই বলে ওঠে ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে কথাই কইব না।

—কেন?

—নিজে চলে গেলে মায়ের আদর খেতে, এদিকে নানা গোলমালে শহরে কেমন যে বিশ্রী লাগছিল। কলেজের সোস্যালে গান গাইতে হবে—তাও আর ভাল লাগছিল না।

প্রদীপ আজ বলে ওঠে তাদের আগামী ঝড়ের কথা।

—সব বদলে যাচ্ছে শীলা, এ কোন সর্বনাশ ভাঙনের মুখে আমরা জন্মেছি জানি না। সব আশা আনন্দের কিছুমাত্র দাম নেই।

শীলা এসব মানতে চায় না। হালকাভাবেই উড়িয়ে দিতে চায় খুসীর আবেশে।

—থামো দিকি তুমি! আচ্ছা কোন্ গানটা গাইবে সোস্যালে। তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু।

—আমি!

—হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। আপনি প্রদীপ চ্যাটার্জি।

প্রদীপের মন যেন খানিকটা ভরসা পায়; যত বিপদই আসুক শীলার কাছে এলে মনে যেন সাহস পায়। খুঁজে পায় একটি তৃপ্তির আবেশ।

সেদিন বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছে সন্ধ্যাবেলায় শীলাকে, ওর মা ওকে দেখে একটু অবাক হয়। শীলার দিকে চাইল একবার, ওরদিকে সন্ধ্যানী দৃষ্টিতে।

শীলা বলে ওঠে—সোস্যালে যাবার নিমন্ত্রণ করলাম মা ওকে। যেতে কি চায়!

মা একবার মেয়ের দিকে চেয়ে মাথা নামাল। মুখে অন্ধকার নামে। অতীতের সন্ধ্যার কাহিনীটা ও যেন পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার কাছে।

মায়ের চোখ এড়ায়নি এই পরিবর্তন। দিনরাত যে মেয়ে কলেজ পড়াশোনা আর বাড়ি ছাড়া জানতো না, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ঘোরাফেরাও ছিল সীমিত। সেই শান্ত মেয়েটি হঠাৎ যেন কেমন বদলে গেছে। সুর এসেছে ওর গানে, চাপল্য ফুটে ওঠে ওর হাবভাব চালচলনে, কথাবার্তায়। প্রদীপকে আসতে দেখে সেই ছুটে যায়—মায়ের আগে অভ্যর্থনা জানায় কলকণ্ঠে।

—আরে, যাক পথ চিনে এসেছেন তাহলে? কেমন আছেন? আসুন! দরজাটা খুলে দিয়ে নিজেও বসে পড়ে কথা বলতে। ওদের হাসির শব্দে ঘর ভরে ওঠে।

মা মেয়ের এই অকারণ আনন্দকে ঠিক ভালভাবে নিতে পারে না; শীলা এগিয়ে চলেছে একটু বেগেই। মা চিন্তায় পড়ে মেয়েকে নিয়ে। ও মেয়ে কথাবার্তা কারো শুনবে না। মাথা সোজা একগুঁয়ে মেয়ে। ওর এই মেলামেশাটা ঠিক সমর্থন করতে পারে না মা।

স্বামীর কাছে যে সব ব্যাপার শুনেছে প্রদীপদের বংশের সম্বন্ধে। সেই পরিবারে শীলার ঠাঁই কোনদিনই হবে না। প্রথমতঃ আটকাবে প্রদীপরা ব্রাহ্মণ, নিষ্ঠাবান পরিবার, এরা তার থেকে দু-তিন ধাপ নিচে; প্রতাপনারায়ণকে দেখেছে সে নিজে—বহুবার স্টেশনে এসেছে নানা কাজে; সেখানে থাকতে লোকের মুখে শুনেছিল তার অত্যাচারের, শাসনের নানা কাহিনী। কঠিন একটি ইস্পাতে গড়া মানুষ তারা। প্রাণনিয়ে খেলা তাদের পেশা।

শীলা তাদের পরিচয় জানে না—তাই বহু আশা নিয়েই এগিয়ে চলেছে, মনে তার নানা স্বপ্ন। প্রদীপও হয়তো তার বাবাকেই চেনেনি। না হয় জমিদারবাড়ির নীলরক্তের সঙ্গে জড়িত নেশা নিয়েই শীলার সঙ্গে মিশেছে—যেদিন খেয়ালখুশী থামবে সেওমেলামেশা বন্ধ করবে শীলার সঙ্গে। আবর্জনার মত ফেলে চলে যাবে—এই ওদের বংশের স্বরূপ। শীলা জানে না ওদের এই স্বরূপের কথা।

মা হয়ে মেয়ের এই চরম অপমানটা নীরবে মানতে পারবে না সে। শীলাও সেই নিদারুণ আঘাতে মুষড়ে পড়বে। সাত-পাঁচ কি সব ভাবছে মা কিছুদিন থেকেই। এ সমস্যার একটা সমাধান করা দরকার। শেষ অবধি ভেবেচিন্তে একটা পথই নেবার ঠিক করে স্বামীকে কথাটা জানাবার চেষ্টা করে,—সেদিন স্বামীকেই একথা সেকথার পর জানায় মনোরমা ব্যাপারটা। অবিনাশবাবু শান্তিপ্রিয় লোক। এসব ঝামেলায় থাকতে নারাজ, বিশেষ করে এমনি একটা গুরুতর ব্যাপারে। খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রা দেওয়া অভ্যাস; হাতের কাগজখানা ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে, চশমাটা খুলে পাশে রেখে তিনিও চোখ বোজেন, মৃদুমন্দ নাসিকাধ্বনি শোনা যায়। সাতে-পাঁচে থাকতে চান না তিনি।

এই শান্তিসুখটুকু আজ মাথায় ওঠে স্ত্রীর কথায়।

—তুমি প্রদীপকে যা হয় কিছু বলো, আমার বাবু ভালো ঠেকছে না। বসন্তও ক-দিন আসেনি। যে জেদী মেয়ে তোমার তাকে পারা দায়।

অবিনাশবাবু পরিষ্কার জবাব দেন—ওসব ব্যাপারে আবার আমাকে কেন? তুমিই তো পারো। বলে দাও সোজাসুজি। তাছাড়া এসব তো আজকাল চলে, দোষটাই বা কি? যদি ধরো ওরা দুজনে—

মনোরমা থামিয়ে দেয় স্বামীকে—থাক ঢের হয়েছে। জমিদার প্রতাপনারায়ণের সামনে এই কথাটা বলতে পারো? সেই বাঘমারা জমিদারের সামনে?

ঘাবড়ে যান অবিনাশবাবু, বাঘমারা খুনে ছোটবাবুর সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ ঘোড়ায়-চাপা দেহখানা মনে পড়ে, একটা ভর-জোয়ান লোককে রেকাব থেকে পা তুলে লাথি মেরেছিল স্টেশনের সামনে, লোকটার দাঁতকটা উড়ে গিয়েছিল। সেবার দামোদরের মানাচর দখলের দাঙ্গার সময় দেখেছে নিজে রাইফেলহাতে

প্রতাপনারায়ণকে তাক করতে। দবরদস্ত একটি কঠিন মানুষ। পিঙ্গল চোখ দুটোর দিকে চাওয়া যায় না। কি একটা তীব্র জ্বালা ফুটে ওঠে তার থেকে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে এইসব বিয়ের কথাবার্তা !

স্ত্রীর কথায় আমতা আমতা করেন। না, না—তোমাকেই বলছিলাম আর কি! দরকার নেই বাপু ঝামেলায়, শীলাকে খুব শাসন করে দাও, আচ্ছাসে। এসব কি আজকাল মেয়েদের ফ্যাসান ?

—যা হয় করছি আমি। চিন্তিত মনে মনোরমা বের হয়ে এল স্বামীর ঘর থেকে। কি যেন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছে সে।

শীলা বৈকালে বড় একটা বের হয় না, আজ সে সেজেগুজে তৈরী হয়ে এসে মায়ের সামনে দাঁড়ায়। মা-ই যেন নিজের মেয়েকে চিনতে পারে না আজ। ফুলে ফুলে উপছেপড়া গাছের মত সুন্দর হয়ে উঠেছে। মুখে চোখে হাসির মধুর আভা। হালকা কণ্ঠে বলে ওঠে শীলা—মা, সন্ধ্যেবেলাতেই ফিরবো।

প্রদীপের সঙ্গে ট্যাক্সিতে কোথায় যেন বের হয়ে গেল। মনোরমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়, বাধা দেবার ক্ষমতাটুকুও নেই যেন তার। নইলে আজই ওর কঠিন কথাগুলো শীলাকে বললেই পারতো প্রদীপের সামনে। মায়ের মন কি যেন এক অজানা বেদনায় ভরে ওঠে।

এমনি সময়ে একদিন বসন্তকে আসতে দেখে মনোরমা একটু জোর পায় মনে। বেশ জোরের সঙ্গেই জানায় বসন্তকে কথাগুলো।

—এটা আমার ভালো ঠেকে না বাবা, তোমার বন্ধু বলে আসা-যাওয়া করে তাই ভালো। চোখের ওপর এতটা বাড়াবাড়ি কেমন বিশ্রী ঠেকে। পাড়ায় পাঁচজন বাস করে, তারাই বা রোজই এসব দেখলে ভাববে কি!

বসন্ত চুপ করে থাকে কথাটা শুনে। প্রদীপের উপর তার

আশা-ভরসা অনেক ছিল। বুদ্ধিমান পরিশ্রমী সৎ একটি ছেলে। মস্তবড় পরিবারের সন্তান, তার প্রতিষ্ঠা দিয়ে অনেক বড় কাজ করতে পারতো সে। কিন্তু এমনি করে তার সব ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে ভাবতে পারেনি। কিন্তু কেমন চটে ওঠে। কিছুদিন থেকে প্রদীপের কথাবার্তা ব্যবহারে তেমনি একটি পরিবর্তন দেখেছে। তার সঙ্গে ভাল করে মেশেও না। পড়াশোনা যা হয় করে, বাকী সময় বাইরেই থাকে বোধহয় এইখানে।

ফাঁক দেখে অবিনাশবাবুও উঠে এসেছেন। চায়ের পেয়ালা হাতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে বেশ জোরগলায় বলে চলেন—

—আইনে থাকলে আমিও বন্দীপুরের জমিদারদের পাত্তা দিইনি। জমিদার-ফমিদার ঢের দেখেছি, ওসব রেল কোম্পানী মানতে যাবে কেন? গেট আউট। আমি হুমকিতে ডরাইনি। লাঠিবাজি করবে বাজারে করগে, প্ল্যাটফরমে ঢুকতে দোব না বিনা টিকিটে। কতবার ওর বাপের চেলাদের হটিয়ে দিয়েছি। সেবার নবনী মিত্রের সঙ্গে কি যেন ইটভাটা দখল নিয়ে লাগল দাঙ্গা; প্রতাপনারায়ণের দলের কাছে তাড়া খেয়ে ওরা ইস্টিশনে ঢুকেছে। কেউ জখম হয়েছে কারোও মাথা ফেটেছে—রক্তারক্তি কাণ্ড। প্রতাপনারায়ণের সর্দার অনা ডোম তো মাথায় লাল ফেটি বেঁধে এসে চড়াও হবে ইস্টিশনে—একা এই শর্মাই রুখেছিল তাদের। দেখ বাবা, একবার টরেটক্কা বাজাবো অমনি হুড়মুড়িয়ে বর্ধমান, আসানসোল থেকে রেলপুলিশ চলে আসবে, দেখবি তখন মজাটা। ব্যস—লালপাগড়ির নাম শোনা অমনি হাওয়ায় উবে গেল বাছাধনরা। ওদের টাইট দিয়েছি আমি—

মনোরমা থামিয়ে দেয় স্বামীকে—একটু চুপ করো দিকি। খুব বীরপুরুষ ছিলে বুঝেছি।

বসন্ত চুপ করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

সেদিন রাতে শীলা বাড়ি ফিরে অবাক হয়, মা তখনও বসে আছে রান্নাঘরের বারান্দায়। দাদার নাইট ডিউটি, দাদা বের হয়েছে। বাবার ঘরে আলো জ্বলছে তখনও কাশির শব্দ শোনা যায়। বাড়িতে পা দিয়ে অনুভব করে কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। ঝড় ওঠার আগেকার আকাশের মত একটা নিস্তব্ধতা ছেয়ে রয়েছে বাড়িখানাকে। মায়ের দিকে চেয়ে শীলা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। শীলার মনে একটা হালকা খুসীর আভা। দুজনে আজ বহুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে। সিনেমায় যেতে চেয়েছিল প্রদীপ। বাধা দেয় শীলা।

—বদ্ধ গুমোট গরমে তো দিনরাতই থাকি, চলো দুজনে কোথাও ফাঁকায় বসা যাক।

মুক্ত উদার পৃথিবীর সঙ্গে আজ খুসীর স্রোতে ভর করে যেন উধাও হয়ে যেতে চায় শীলা। কয়েকটা মাস কেটেছে পড়া আর পাস করার আনন্দে। একটা বাধা উত্তীর্ণ হয়ে যেন খানিকটা হারানো প্রাণচাঞ্চল্যকে আবার ফিরে পেয়েছে সে। ছোট্ট মেয়ের মত শীলা খুসীতে ফেটে পড়ে—

—উঃ পাস করে যেন বেঁচেছি!

—আবার তো পড়বে, এইবার থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারের ঠ্যালা বুঝতে পারবে।

প্রদীপের কথায় একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে গালে বোলাতে বোলাতে বলে ওঠে শীলা—উঁহু, আর পড়বো না।

—তবে কি করবে?

শীলা প্রদীপের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তারার জোনাকজ্বলা রাত্রি। গঙ্গার হিমশীতল হাওয়া ভেসে আসে, কোথায় গাছগাছালির মাথায় পাখীর টুকরো শব্দ। বাসায় ফিরেছে রাতের পাখী—ডানায় ওদের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের একটু আশ্বাস।

শীলা হঠাৎ হেসে ফেলে—জানি না।

প্রদীপ ওর রহস্যময়ী মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে—অজানা অধরা ওই শীলা।

সেই হাসির সুররেশ হঠাৎ শীলার কাছে বেসুরো ঠেকে মায়ের ডাকে। বসে আছে মা। বেশ কঠিন কণ্ঠেই মেয়েকে আজ কৈফিয়ৎ-এর সুরে প্রশ্ন করে—

—এত রাত্রি হোল?

—হয়ে গেল কথায় কথায়। শীলা মায়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে।

মনোরমা গজগজ করে—এত কি কথা থাকতে পারে জানি না বাছা। লোকেই বা বলবে কি! ছিঃ ছিঃ, আমাদের সময়ে এমন শিক্ষা ছিল না, এমন বেহায়াপনা—

—মা! শীলা মায়ের কথায় দৃঢ় প্রতিবাদ করে ওঠে।

মনোরমা আজ কথা বলবার জন্যই তৈরী হয়ে রয়েছে। মেয়ের প্রতিবাদে ফেটে পড়ে শতখান হয়ে বলে—ওসব কথা থাক বাছা। আমার ভালো লাগে না এসব তাই বললাম। এবাড়িতে থাকতে গেলে বৌ-ঝিদের মতই থাকতে হবে। এবাড়ির একটা আব্রু ইজ্জত আছে সেটা ভুলে গেলে চলবে না।

শীলাকে মুখের উপর কথাগুলো জোর করে শুনিয়ে দিয়ে মনোরমা উঠে গেল। শীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছে সে।

—ঠাকুর-ঝি!

বৌদির ডাকে মুখ তুলে চাইল শীলা।

বৌদি এগিয়ে আসে—মায়ের কথায় রাগ করো না, বয়স হয়েছে, সংসারের নানা অশান্তিতে মনটা বিগড়ে গেছে।

শীলা কথা কইল না, একটু চুপ করে থেকে বৌদিকে বলে ওঠে।

—আমার খিদে নেই, তুমি খেয়ে নাওগে বৌদি।

নিজের ঘরে এসে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে কাপড়-চোপড় না ছেড়েই খাটে এসে বসল।

রাত্রি কত জানে না। বাইরের বাড়িগুলোর আলো দু-একটা করে নিবে আসছে। শান্ত স্তিমিত অন্ধকার। মনে একটা চাপা জ্বালা ওঠে; একটু ভালভাবে বাঁচতে চেয়েছিল শীলা—এই তার অপরাধ। মা-বাবা কেউ যেন সেটা সহ্য করতে রাজী নয়। সবাই তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপের কথা মনে পড়ে। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, ধারা দেহে যৌবনের শান্ত মাধুর্য। কেমন যেন অন্যজগতের লোক সে, শীলার মন তমসা ঢাকা রাত্রের আকাশে কোথাও উধাও হয়।

হু-হু কান্না আসে, মা তাকে এমনি জঘন্যভাবে অপমান করবে ভাবতে পারেনি। সারামন হু-হু জ্বলে ওঠে।

দূর আকাশে মিটি-মিটি জ্বলছে কয়েকটা তারা; একটি মধু-সন্ধ্যার আনন্দস্পর্শের ওরা ছিল সাক্ষী; আজকের এই বুকচাপা নির্জন ক্রন্দনও ওরা দেখছে স্তব্ধ নির্বাক হয়ে।

মায়ের জ্বালাপোড়ার কারণ কিছুটা অনুমান করতে পারে শীলা। ওবাড়ির প্রতিমা চাকরি করছে, নিচেতলার কুসুমবৌদি চাকরি করে স্বামী শাশুড়ীর হাতে তুলে দেয় মাস মাইনের টাকা। সবাই সাহায্য করে সংসারে, পাঁচজনের পরিশ্রমে মধ্যবিত্ত ঘরের চাকা চলে। শীলা সেই প্রাথমিক ভুলটাই করে চলেছে। দেয় না সংসারে কিছুই, শুধু নিয়েই চলেছে। বোঝা হয়ে রয়েছে এবাড়ির, তাই তার সামান্যমাত্র ভুল—বাড়তি পাবার আশাটুকু কেউ বরদাস্ত করতে চায় না।

চুপ করে কি ভাবছো। মায়ের সমস্ত স্বরূপটা আজ যেন তার কাছে পরিষ্কারভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। বাবাও পিছনে থেকে মায়ের এই নিষ্ঠুর কদর্য ব্যবহারটাতে সায় দিয়েছে—সমর্থন করেছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। ঘুম ভাঙে ভোরের দিকেই। রাস্তায় প্রথম গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে। ময়লাবোঝাই

কর্পোরেশনের গাড়িগুলো চলেছে, ধাঙড়দের টুকরো গানের সুর শোনা যায়। বিছানায় ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে শীলা।

সারারাত্রি বিশ্রাম করে নতুন করে ভাবতে পারে; কাল রাত্রের সেই ঘটনাটা মনে পড়ছে, কেমন যেন একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করে। লজ্জাস্কর একটি অনুভূতি। মায়ের এই অপমানের জবাব সে দেবেই।

সকালেই স্নানটান করে বের হবার আয়োজন করে শীলা। কাল রাত্রের ওই কথাবার্তার পর মনোরমাও শান্তি পায়নি। মেয়েকে ওই কথাগুলো এত কর্কশভাবে বলবার ইচ্ছে তার ছিল না, কিন্তু কথায় কথায় কি যেন হয়ে গেল কোন্‌দিকে সঠিক মনোরমাও বুঝতে পারেনি। নিজেরই লজ্জা করে। সকালবেলায় শীলাকে স্নান করে বের হবার আয়োজন করতে দেখে এগিয়ে আসে মনোরমা। বলে ওঠে—

—কাল রাত্রে খাসনি কিছু, সাতসকালে কোথায় বেরুবি আবার?

মায়ের কণ্ঠস্বরে সেই তেজদাপ আজ উবে গেছে এটা অনুমান করতে দেরী হয় না শীলার। মায়ের দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে ছোট্ট জবাব দেয়—

—একটু দরকার আছে। বের হতে হবে একবার।

মা মেয়ের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যা। অকারণে মেয়েকে প্রশ্ন না করে অভিযোগ করাটা ঠিক হয়নি।

মনোরমা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। শীলা পরেছে সাদামাটা একটা শাড়ি, কালকের রাত্রের সেই অভিসারিকার সাজ এ নয়, সাধারণ খেটে-খাওয়া ঘরের মেয়ে; জীবনে যারা পাবার স্বপ্ন দেখেও কোন ভুল করে না এ যেন তাদেরই একজন। আজ অন্তর বাইরে সে বদলে গেছে এক রাত্রির ঝড়ে।

ব্যাগের ভিতর কি সব সার্টিফিকেট কাগজপত্র নিয়ে বের হয়ে গেল চটি ফটাস-ফটাস করে। মনোরমা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখল মাত্র। কিছু বলতেও যেন সাহস হয় না।

অবিনাশবাবু খবরের কাগজখানা এতক্ষণ আড়াল দিয়ে যেন আত্মগোপন করেছিলেন, শীলা বের হয়ে যেতেই বলে ওঠেন স্ত্রীকে,—

—না খেয়ে বের হয়ে গেল মেয়েটা ?

মনোরমা স্বামীর কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—

—তুমিও তো ঠায় বসে আছো, একবার মুখের বাক্যি খসালেই তো পারতে !

অবিনাশবাবু চুপ করে যান স্ত্রীর এক ধমকেই। ঠিক যেন মেয়েদের চিনতে পারেন না, হোক না স্ত্রী আর নিজের মেয়ে। সব জায়গাতেই তারা এক ধাতের, নিজের কোট কেউ ছাড়তে রাজী নয়।

কয়েকদিন আর দেখা পায়নি প্রদীপ শীলার। রোজকার মতই কলেজ থেকে বের হয়ে চারিদিকে খোঁজে ব্যাকুল হয়ে, ওপারের বকুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো শীলা, পরণে হালকা চাঁপা-রংএর শাড়ী, মুখে হাসির মিষ্টি আভা। এগিয়ে আসতো সাগ্রহে।

প্রদীপের মনের রং বদলে যেত। কয়েকদিন ধরে তার দেখা পায়নি।

মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কে জানে হয়তো শরীর খারাপ। নইলে আসা বন্ধ হবে কেন। বসন্তকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারেনি। কেমন বাধ বাধ ঠেকে। দুঃসহ একটি লজ্জা এসে বাধা দেয়।

সেদিন কি ভেবে শীলাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় প্রদীপ কি এক দুর্বার আকর্ষণে।

মনোরমা ক-দিন থেকে যেন বদলে গেছে। শীলা রাগ করেই যেন পড়াশোনা ছেড়ে দিতে চায়। কত সাধ ছিল মেয়ে অন্ততঃ এম-এটা পাস করবে। কিন্তু তা হয় না। শীলা সেদিন মুখের ওপরই জবাব দেয়—ঢের লেখাপড়া শিখেছি। এতেই তোমাদের সংসারে মাস মাস কিছু সাহায্য করে দেনা শোধ করবো। আর ঋণী হতে চাই না।

এযুগের মেয়ে বিয়ের পর ইন্দুর গর্তের মাটি দিয়েই পিতৃমাতৃ ঋণ শোধ করে না। চাকরি করে সংসারের ভরণপোষণ যোগায়। মনোরমা কথা বলে নি। চুপ করে শুনেছিল ওর কথাগুলো।

মেয়ে যেন চাপা রাগে জ্বলছে।

আজ প্রদীপকে আসতে দেখে একটু অবাক হয় মা। ওর জন্যই যেন মেয়ে বদলে গেছে। সংসারের শান্তি নষ্ট হয়েছে। একটু ভদ্রভাবেই মনের জ্বালা চেপে রেখে বলে মনোরমা—এসো বাবা! তা শীলা তো বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে চাকরির জন্য। বললে নাকি ইনটারভিউ আছে।

—চাকরি! অবাক হয়ে যায় প্রদীপ।

মনোরমাই বলে—হ্যাঁ। একটা কথা বলছিলাম বাবা—গরীবের ঘরের মেয়ে তাদের পড়াশোনা করতে হবে, চাকরিও করতে হবে। তাদের যেচে কি আর বিয়ে করবে বল! মিছিমিছি ঠকানো কি ভালো?

প্রদীপ চমকে ওঠে! একি শুনছে সে! জবাব দিতে গিয়েও পারে না। বসন্তের মতই কথা বলছেন উনি। নীলরক্ত তার গায়ে। মেয়েদের ঠকানো যেন তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। একি নিদারুণ অবহেলা—মিথ্যা অপবাদ।

জবাব দিতেও পারে না। উঠে দাঁড়াল প্রদীপ। মনোরমা চেয়ে থাকে ওর দিকে, কথাটা তাহলে সত্যি। তাই এত জ্বালা-বোধ করেছে সে।

—চা খাবে না বাবা।

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়েছে। জবাব না দিয়েই বের হয়ে এল প্রদীপ। পায়ের নিচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে। চোখের সামনে সব কিছু যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

চলে আসছে ট্রামরাস্তার দিকে। বৈকালের রোদ গেরুয়া হয়ে আসে। হঠাৎ কার ডাক শুনে দাঁড়াল।

—তুমি!...

শীলা এগিয়ে আসছে তার দিকে। ক্লান্তির চিহ্ন সারা শরীরে পরিস্ফুট। ঘামে চুলগুলো এসে কপালে জমেছে দু-এক গাছি।

কেমন যেন অন্য কোন মেয়ে। সেই চঞ্চলা যৌবনবতী কিশোরী নয়। এ কোন খেটে খাওয়া একটি প্রাণী, জীবন যাকে বিদ্রূপ করেছে শুধু।

প্রদীপের মুখের দিকে চেয়েছে একটু অবাক হয়ে। সুগৌর বর্ণ টকটকে হয়ে উঠেছে। সমস্ত শরীরের রক্ত যেন এসে জমেছে মুখে। ব্যাপারটা কিছু অনুমান করে নেয়।

—মা কিছু বলেছে?

—বলেছেন তোমাকে নাকি আমি ঠকিয়েছি।

চারিদিকের লোকজন যেন ওদের দিকে চেয়ে আছে। আধাচেনা পাড়া। ওর কণ্ঠস্বর বেদনার্ত। শীলা আপাততঃ থামবার জন্যই বলে—একটু চল। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

প্রদীপ ওর দিকে চাইল। অপমানিত বোধ করেছে সে নিদারুণ ভাবে। কিন্তু শীলার বেদনাভরা চোখের দিকে চেয়ে আপাততঃ সেটা প্রকাশ না করে চলতে থাকে।

পার্কের শিরীষচটকা গাছে আঁধার নেমেছে। মাঝে মাঝে জ্বলছে দু-একটা আলো। গোলমোহর গাছের হলদে ফুলগুলোও দেখা যায় না। চুপ করে বসে আছে দুজনে পাশাপাশি।

শীলাও মন স্থির করে ফেলেছে। প্রদীপ বলে ওঠে—

—জবাব আমি দিতে পারতাম।

—না দিয়ে ভালোই করেছ। ওঁদেরই বা দোষ কি প্রদীপ! কষ্ট করে পড়িয়েছেন। ওদের তো দাবী আছে।

—তোমার নিজের পথ!

প্রদীপের কথায় বলে ওঠে শীলা—এযুগে পথ আমরা কেউই পাইনি প্রদীপ। এমনি অন্ধকারে কোথায় সবাই হারিয়ে গেছি।

প্রদীপ কি ভাবছে। আজ সারা শরীরে রক্তে একটা প্রবল চাঞ্চল্য বোধ করে সে। সব বাঁধন ছেঁড়ার দুর্বার প্রয়াস। সব বাধা অতিক্রম করে শীলাকে পেতে চায় সে।

শীলা বাধা দেয়—তা আমি পারি না প্রদীপ।

চমকে ওঠে প্রদীপ—তবে মা যে বললেন তোমাকে আমি ঠকিয়েছি!

ঠকাও নি! অন্য জগতের সন্ধান দিয়েছিলে যে জগতে আমাদের ঠাঁই নেই।

একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে শীলা—যাই, মা ভাববে। উঠে চলে গেল শীলা। চুপ করে একলা বসে আছে প্রদীপ। সে দেখল ছায়াচ্ছন্ন গাছের নিচে গিয়ে হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়েছে শীলা। নিজের হাতে সে যেন সব বাধন ছিঁড়ে চলে এল।

বাড়িতে ঢুকে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়, মনে করেছিল মা কিছু বলবে। কিন্তু দেখে শীলা মা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেল। কোনো কথাই বলে না। মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

—শরীর খারাপ হ্যাঁরে?

—না! খুব ভালো আছি।

অভিমানভরে মাকে জবাব দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

বসন্ত কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। আজ সন্ধ্যায় শীলাদের বাড়ি যেতে শীলার মাই খবরটা দেয়, প্রদীপ এসেছিল,

আজ পরিষ্কার তাকে জানিয়ে দিয়েছে সবকথা। নিষেধ করে দিয়েছে মেয়ের সঙ্গে মিশতে।

বসন্ত যেন মনে মনে খুসীই হয়েছে। প্রদীপের উপর তার অনেক আশা ভরসা। ভালোছেলে স্ট্যাণ্ড করবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তার ভালো লাগেনি।

প্রদীপ পার্কে কতক্ষণ বসেছিল জানে না, পার্ক জনহীন হয়ে আসে। বাইরে অন্ধকারের বুকে আলো জ্বেলে দোতলা বাস দু-একটা ছুটে যায়।

আস্তে আস্তে পার্ক থেকে বের হয়ে আসে প্রদীপ, সমস্ত চিন্তা-ধারা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে তার।

বসন্ত জেগেই বসেছিল ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। প্রদীপ কি যেন ভাবছে। চারিদিকে ভাঙনের ঝড় উঠেছে, আগেকার মত অবস্থা হলে আজ পূর্ণতার মাঝে যেমন করেই হোক শীলাকে নিয়ে যেতো। এখন সেই বাবার পোষ্য, সংসারের অবস্থাও কোন্ নিচে নেমে যাচ্ছে তীব্র গতিতে তাও জানে সে।

এ যেন পরম এক দুঃসময়, যুগসন্ধিক্ষণ। এখন মানুষের পথ কোনদিকেই নেই। শীলার কথাই মনে পড়ে—সবাই যেন অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

তাই শীলা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। প্রদীপের মনে ব্যর্থ বিক্ষোভের ঝড়।

বসন্ত বলে ওঠে—পড়াশোনা করবে?

জবাব দিল না প্রদীপ। আপন মনে জিনিসপত্র গোছাতে থাকে। কয়েকদিন কলেজ বন্ধ। বাড়িতেই চলে যাবে সে।

বসন্ত বলে ওঠে ওসব ছেলেমানুষি ছাড়, মানুষ হতে হবে। কাজ কর মন দিয়ে।

—জানি।

এই কঠিন শিক্ষা আজ প্রদীপ বহু মূল্য দিয়েই পেয়েছে।

নিজেকে চিনেছে যেন নোতুন করে এই ঝড়ের মুখে। মানুষ আর এযুগের উপর যেন জমে উঠেছে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ।

বসন্ত ওর দিকে চেয়ে থাকে—রাগ করলি?

—না।

শীলার উপরই রাগ করেনি সে। করতে পারেনি। শীলাই যেন নিজে থেকে সরে যেতে চায়, ও যেন কি একটা ভুলই করেছিল। প্রদীপ কিন্তু আজও বিশ্বাস করে কোন ভুলই সে করেনি। সব কিছুর জন্য তৈরী ছিল সে। কিন্তু আবিষ্কার করে—সেই ভাবে বাঁচার দিন কবে তার অজানাতেই ফুরিয়ে গেছে। বসন্তও অন্যভাবে সেই কথা জানিয়ে দিতে চায়।

প্রদীপ বসন্তের কথার ভাবটা ঠিক যেন ধরতে পারেনি। তার উপর অকারণে রাগ আর অভিমানই করে বসে। এতদিন পর্যন্ত একটা স্বভাব তার গড়ে উঠেছে বন্দীপুরের আবহাওয়ায়। বংশেরই ধারা সেটা। একগুঁয়েমি—গোঁয়াতুর্মি। নিজের মতে না চললে সেখানে কোন আপোষ করতে জানে না। শত চেষ্টা করে প্রদীপও সেই বদস্বভাবটাকে শোধরাতে পারেনি।

নিজের মতটাই তার কাছে সবচেয়ে শ্রদ্ধার। সেখানে ভুল কিছু থাকতে পারে না। তাছাড়া অন্যের পরামর্শ নিতেও বাধে তার।

তাই বোধহয় সেদিন বের হয়ে পড়েছে সেই রাত্রের শেষে ট্রেনেই কলকাতা থেকে। বসন্তকে ঠিক সমর্থন করতে পারে না। মানে না ওর কথাগুলো। মুখোমুখি ঝগড়া করার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই কলকাতা থেকে সেই রাত্রেই বেরহয়ে পড়ে প্রদীপ। ক-দিন একটু বিশ্রাম চায়; উত্তপ্ত দেহমন ক-দিন চায় বাড়ির শান্তির সন্ধান। সবকিছু সে ভুলে যেতে চায়। সেই ব্যাকুলতা নিয়েই ছুটে এসেছে নিভৃত এই পল্লীতে; এইটুকু তার শান্তি-স্বস্তি পাবার শেষ আশ্রয়। সেই আশা নিয়েই বাড়িতে এসেছে প্রদীপ।

কিন্তু জ্বালাভরা মন নিয়ে যেখানে, যাদের মধ্যে শান্তি খুঁজতে এসেছিল সেখানে পা দিয়েই হতাশ হয়েছে। বেদনা আর হতাশা মনে-মনে বেড়েই ওঠে। বাবা—মা—ওই বিরাট ধ্বংসপুরীর মত প্রাসাদ আজ তার জন্য কোন শান্তি স্বস্তির অবশেষটুকুও রাখেনি। এই শালবনসীমাও মুছে আসছে কুঠার ট্রাক্টরের আঘাতে। কলস্রোতা দামোদরের যৌবনপ্রবাহে পড়েছে বাধার লৌহকপাট। দিনেরাতে শান্ত মৃত্তিকার বুক ওরা ক্ষতিবিক্ষত করে চলেছে।

এ কোথায় এসে পড়েছে প্রদীপ, কোন্ অগ্নিকুণ্ডে—ঠিক অনুমান করতে পারে না। চুপ করে অপরিচিতের মত চেয়ে থাকে ওই মহা পরিবর্তনের তুমুল স্রোতের দিকে।

কেমার কোম্পানির কারখানার সীমানা দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছে। একা নবনী মিত্র নয় বিক্রমনারায়ণও পার্টনার। বনের মধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উঠছে প্রথমশ্রেণীর সাদামাটি। ফায়ার ক্লে কালীপুর থেকে বনের মধ্য পর্যন্ত সোজা ট্রলি লাইন বসিয়ে যোগাযোগ করেছে তারা। একটার জায়গায় উঠেছে তিনটে চিমনি। ফায়ার-ব্রিকস্—পাইপ তৈরী করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না তারা। দিনরাত তিনসিপটে কাজ চলেছে।

ওদিকে একটু দূরে বনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিরাট লোহা-কারখানা। দেশবিদেশের ইঞ্জিনিয়ার কর্মীরা এসে জুটেছে। মামড়ার কাছারিবাড়ি আজ নিশ্চিহ্ন, সেখানে গড়ে উঠেছে শক্ত ষ্টিল ফ্রেমের প্রাসাদ। ওদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বন কেটে বসছে কলকব্জা, বয়লার ব্লাস্ট ফার্নেসের যন্ত্রপাতি ; আকাশচুম্বী টাওয়ার থেকে কনভেয়ার বেল্ট-এর ঝকঝকে করোগেট কেসিংগুলো নেমে এসেছে। রোদে ঝলমল করে বাতাসে বিজাতীয় যন্ত্রের গর্জনধ্বনি।

প্রদীপ নির্জন গ্রাম ছেড়ে পথে নেমেছে। বড়রাস্তায় চলা দায়। রকমারি গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে লোকজন—সাহেবসুবো—পাঞ্জাবী

গুজরাটী ঠিকেদারের দল। লাঞ্ছময়ী কালীপুর। সমস্ত কিছুই এর বদলে গেছে। লোকজন এসেছে নতুন উষ্ণ রক্তপ্রবাহ। লোকজন এসেছে—এসেছে নোতুন যন্ত্রজীবনের প্রচণ্ড ঢেউ, বনভূমি সবকিছু করে। কাউকে এদের চেনে না প্রদীপ। আনমনে চলতে চলতে বনের ধারে একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। কেমার কোম্পানির মাটিতোলা বাতিল খাদের ধারে এখনও টিকে আছে সেই ঝাঁকড়া বটগাছটা। টই-টই করছে খালভর্তি কালো জল। অনেক গভীর নিথর তার বুক। এতদিন ধরে কালীপুরকে সেই যুগিয়েছে তৃষ্ণার জল। আজ তাকে কেউ ফিরেও দেখে না। তার ঘাটে এসে কলসী ভরতে গিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে দিগন্তসীমার দিকে চেয়ে বাপের বাড়ির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না অলস অপরাহ্নবেলায় কোন নতুন বউ।

কালীপুরের সেই অন্তরাত্মার অপমৃত্যু ঘটেছে। তারা সবাই কোথায় হারিয়ে গেছে আজ।

অপরাহ্নের ম্লান আলোয় প্রদীপ ওর দিকে চেয়ে আছে—শান্ত নিথর জলরাশির দিকে।

শুধু টিকে আছে বটতলার সেই ঝুপড়ি ধেনো মদের দোকানটা, জমে উঠেছে রীতিমত। কাদের জড়িত কণ্ঠের চীৎকার শোনা যায়। হঠাৎ কাকে প্রণাম করতে দেখে চমকে ওঠে প্রদীপ। বন্দীপুরে কালীপুরে এসে দু-দিনের মধ্যে বিশেষ কাউকে দেখেনি, সবাই অচেনা। কোন্ আলাদা রাজ্যে এসে পড়েছিল যেন। হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে চেয়ে থাকে তার দিকে।

নীল হাফপ্যান্ট পরনে, গায়ে একটা ময়লা হাফসার্ট, ঠাঁই ঠাঁই সাদা চীনামাটির দাগে চিত্রবিচিত্র। পা দুটো একটু টলছে। মুখেচোখে কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। তামাটে হয়ে উঠেছে গায়ের রং।

—পেন্নাম দাদাবাবু! ধেনোমদের গন্ধ ছাড়ছে। চমকে উঠেছে প্রদীপ।

ভাল করে দেখে চিনতে পারে তাকে—অনুকূল না?

অনুকূল উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ সেই—দুর্ধর্ষ অনা ডোম যার গাদাবন্দুকের এক গুলিতে ছিটকে পড়েছে এই বনের বহু নরখাদক বাঘ; যার গর্জনে প্রতিপক্ষের কত লেঠেল লাঠি ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। প্রতাপনারায়ণের পার্শ্বচর সেই অনা ডোম আজ কেমার কোম্পানির চিনকুঠীর সামান্য মজুর। রোজ মাইনে দেড়টাকা। তাকেও আজকের কালীপুর চেনে না।

অনা আপসোস করে—প্যাট বড় বালাই দাদাবাবু, এত খেয়েও ইয়ার খিদে মিটল নাই। শেষমেষ কিনা মাটিকাটার কাজ করে করে দানাপানি যোগাতে হয় ইহাকে।

অনা ডোম আগেকার সেই দিনগুলোর নীরব সাক্ষী। বুকে ওর চাপা আগুনের শিখা—এই জীবনটাকে সে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারেনি। ভিতরে ওর গুমরে উঠছে বিক্ষোভের আগুন। মুখে চোখে তারই প্রকাশ। অনা আজও বেঁচে আছে।

বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে প্রদীপ ওর দিকে, ময়লা গামছার খুঁট দিয়ে অনুকূল চোখ মুছছে। খোঁজ নেয়—

—ছোটহুজুর ভালো আছেন? কতদিন যেতে পারিনি। সব যেন বদলে গেল দাদাবাবু। দু'মুঠো ভাতের অভাব ধরিয়ে দিয়ে সবকিছু লুট করে লিলেক।

রাত্রির আবছা অন্ধকার নামছে চারিদিকে। এখান ওখানে জ্বলে উঠেছে বিজলীর আলো। পাখী ডাকছে দু একটা আবার সব চুপচাপ। ওরা ও ফিরে গেছে ওদের ধাওড়ায়।

বন্য আদিম জীবন কোথায় হারিয়ে গেছে। কোক ওভেনের আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে দামী গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছে কারা। চুপ করে পথ চলছে প্রদীপ। এত প্রাচুর্য এত

অর্থ—তবু কালীপুরের অন্তরের কান্না আজও থামেনি। এত জলুসের আড়ালে অন্য ডোমের মত সকলেরই বুকে চলেছে একটা চাপা প্রতিবাদের ছায়া।

হঠাৎ পথের সামনেই একটা ঝকঝকে গাড়িকে ব্রেক কষতে দেখে সরে দাঁড়াল। অনবরত গাড়ি গিয়ে রাস্তা খাল হয়ে গেছে, ঠাঁই ঠাঁই জমেছে বৃষ্টির জলধারা। সেই কাদাগোলা জল চাকা থেকে ছিটকে ওঠে চারিদিকে।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে কে যেন ডাকছে তাকে,—আরে প্রদীপ না? হ্যালো বয়!

বিজাতীয় কণ্ঠে ডাক শুনে ফিরে চাইল প্রদীপ, ঠিক চিনতে পারে না। হঠাৎ মনে পড়ে অতীতের কথা। স্কুলের শেষ বেঞ্চে বসে থাকতো কালো মুষকো ছেলেটি, এক-একক্লাসে দু'বছর করে পড়ে বেশ পাকাপোক্ত মরদ হয়ে উঠেছে—এসে কায়েমীভাবে ঠেক খেল স্কুলফাইনালে। মিত্রিদের সেই পটলচন্দ্র বলেই মনে হয়। বখাটে পটল।

রাতারাতি সেই পটল কি করে দামী হিলম্যান হাঁকাচ্ছে ঠিক বুঝতে পারে না প্রদীপটা। পটল গল্প করে—

—কবে এলি?

প্রদীপ জবাব দেয়—কাল।

পটলের আর কোন কথা বলার নেই।

—পরে দেখা হবে। বাই বাই।

পটলের সময় নেই। কেবল গাড়িখানা দেখাবার জন্যই যেন অকারণেই একবার থেমে তাকে নিজের প্রাধান্য আর সময়ের দাম সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে আবার উধাও হয়ে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ। অনুকূলের কথা মনে পড়ে। এত টাকাপয়সার প্রাচুর্য্য কোনদিকে কোনখানে গিয়ে যেন জমে আটকে যাচ্ছে তাই দিনান্ত পরিশ্রমে হাজারো অনুকূলের দল পায় মাত্র

একবেলার আহার। কালীপুরের উন্নতি যতই হোক না কেন অনুকূলের দল. সেই অতলেই থাকবে। যত আলোই জ্বলুক ওদের ঘরের জমাট .অন্ধকার কোনদিনই ঘুচবে না। যতই সুর—আনন্দধ্বনি উঠুক তবু কালীপুরের অন্তরের ব্যর্থ কান্না কোনদিনই থামবে না।

বাজারের মধ্য দিয়ে এসে স্টেশনে দাঁড়াল। সেই নির্জন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ খুঁজতে যেন ভুল করেই এই হাটের কোলাহলে এসে পড়েছে।

স্টল থেকে খবরের কাগজ একখানা কিনে বন্দীপুরের পথ ধরে। বাজারের দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। চৌদ্দবাতির হ্যারিকেন চিমনির মিটমিটে আলো নয়; সাঁঝবাতি জ্বেলেই দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করে দোকানদাররা ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়ে রাতের অন্ধকারে আর বাঘের ডাক শোনে না—শোনে না ডাকাতদের দলবদ্ধ পদধ্বনি।

আসমানে ভেসে আসে সভ্যজগতের সংগীতের সুর। রেডিও বাজছে পানের দোকানে। নিওন সাইনবোর্ড জ্বলে—জ্বলে ফ্লোরেসেণ্ট আলো যার এতটুকুও আভা ভুল করে বন্দীপুরের ওই শেওলাঢাকা প্রাসাদে এসে পৌঁছায়নি।

আজও সেখানের বুকজুড়ে তাই অতল অন্ধকার।

আগে কাছারিবাড়ির বাইরে একটা লম্বা টানা চালায় থাকতো খাস হালের জন্য কয়েকজোড়া শখের উত্তুরী বলদ, দুধ খাবার জন্য বড় বড় মুলতানী গাই, তেমনি তেজী বাছুরপাল।…গোয়ালবাড়ির মধ্যে একটা কুয়ো থেকে দু'জন মুনিষ অনবরত জল তুলতো। …গোয়ালবাড়ির পিছনেই তরকারিক্ষেত। অপর্যাপ্ত সারগোবর জমা করা হোত সেখানে। প্রতাপনারায়ণের অবসর সময় কাটতো ওইখানে তরকারিক্ষেত আর বাগানের তদারক করে। তরকারী হতো এ অঞ্চলের মধ্যে সেরা ও দেখবার মত।

আজ সেই শখের গরু-বলদ কোনদিকে উপে গেছে। পড়ে আছে

তরকারিক্ষেত, বন্ধ্যা অজন্মা হয়ে। ঘাস কালকাসিন্দে গাছে ভরে গেছে! চারিপাশের পোক্ত কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে।মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। তরকারিক্ষেতের শেষ প্রান্তে খানিকটা জমি দখল করে নিয়েছে স্টীল প্লাণ্টের সীমানায়; কনক্রিটের পাঁচিল উঠছে ওই দিকে। বাইরেই এই আগাছার ঘন ঝোপ।

সীতাই বলে ওঠে—

—চাষ করবার লোক মেলে না প্রদীপ। এতবড় ক্ষেত কারা চষবে? তাই এমনিই জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে।

—কেন?

প্রদীপের অজ্ঞতায় মা হাসে—মলিন একটু হাসি। পরনে সাদামাটা মিলের একটা শাড়ি; আবছা আলোয় মায়ের দিকে চেয়ে দেখে সে—বেশ কিছু গহনাপত্রও যেন কম কম ঠেকে! হাতে সেই একরাশ চুড়ি চুড় মানতাসাও নেই। যেন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ। কেমন একটা ম্লান রিক্ততা ওকে ঘিরে রয়েছে আজ। আগেকার কোন জৌলুস আর নেই।

সীতা বলে চলেছে—চাষ করবে কেন? কারখানার কাজ করলে নগদ টাকা, প্রভিডেন ফাণ্ড, ছুটি কত কি পায়, সেই খানেই গেছে সবাই।

প্রদীপও কল্পনা করেছিল এমনি একটা ব্যাপার স্বাভাবিক—সত্য এ ব্যাপার। শিল্প জগতের চিরন্তন বিবাদ এই কৃষির সঙ্গে, কিন্তু এর ঝড় প্রকট হয়ে তাদের সামনে উঠবে ভাবেনি।

প্রদীপ চুপ করে শুনে যায় মাত্র। রাতের অন্ধকারে প্রশস্ত ছাদের উপর বসে আছে তারা দু'জনে। প্রতাপনারায়ণ পায়চারি করছে প্রশস্ত ছাদের ওপ্রান্তে। আকাশে উঠেছে কোকওভেনের গ্যাসের জ্বলন্ত একটা হলকা—থেকে থেকে আকাশের উর্ধসীমার দিকে লাফ দিয়ে উঠছে সেটা, সব কিছু গ্রাস করে—পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায় সে।

এখানে থাকতে মন চায় না প্রদীপের মাকে বলে ওঠে—এখান থেকে সরে গিয়ে নিতাইপুরের বাড়িতে গেলেই যেন ভালো হয় মা। সেখানে আজও এই ঝড় ওঠেনি। অন্ততঃ বসবাস শান্তিতে করতে পারবে।

প্রদীপের কথার জবাব দিল না সীতা। এটা যেন তার নিজেরই কথা। এই বিজাতীয় পরিবেশ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বিষ বিষ ঠেকে এখানের বাতাস। এখান থেকে সরে যেতে পারলে বেঁচে যায় সে।

সীতা কিছু বলবার আগে প্রতাপনারায়ণই জবাব দেয়, আবছা আলোয় আঁধারে তার বিশাল দেহটা এগিয়ে আসছে। কণ্ঠস্বরে একটা গাম্ভীর্য।

—তা হয় না প্রদীপ। এই পরিবর্তনকে এড়িয়ে গিয়ে বাঁচা যাবে না, একে মেনে নিয়েই চলতে হবে।

প্রদীপ বাবার দিকে চেয়ে থাকে। স্তব্ধ লোকটির মনে যেন পুঞ্জীভূত ঝড় উঠেছে। মনে মনে এই পাহাড়ী ঢলকে স্বীকার করতে পারেনি—পারলে এই বন্দীপুরের প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতো না, বিক্রমনারায়ণের মত সেও ব্যবসায় নেমে পড়তো—সামন্ততান্ত্রিক যুগ থেকে বৈশ্যযুগের প্রাধান্যকে মেনে নিতো। কিন্তু তাও নেয়নি। প্রদীপ বাবার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কেমন যেন খটকা বাধে তার।

বলে ওঠে প্রতাপনারায়ণ—

—এ যুগকে স্বীকার করতে পারবো, পারতেই হবে কিন্তু এর সংস্পর্শে প্রথমে যে পাঁক উঠছে তাকে—সেই কদর্যতাকে মেনে নিতে পারছি না। আমার কাছে আপোষ নেই—তাই এড়িয়ে রয়েছি মাত্র।

প্রতাপনারায়ণের কথাগুলো প্রদীপ শুনে চলেছে।

রাতের বাতাসে গর্জে ওঠে কোকওভেনের স্টিম টারবাইন—

কোথায় কর্কশ স্বরে বুলডোজার গড়িয়ে চলেছে—কাঁপছে বুনো মাটি।

হঠাৎ বাড়ির পিছনের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে প্রদীপ, আঁধারে দুটো নীল চোখ—আলো পড়ে চিক চিক করছে। প্রদীপের ওই চাহনি খুব চেনা। কতদিন রাত্রে মামড়ার গভীর জঙ্গলে যেতে যেতে দেখেছে ওদের। বনের সদাজাগ্রত প্রহরী ওরা। বাতাসে ওদের নিঃশ্বাস মিশে আছে।

আজ অরণ্যের আদিম পরিবেশ থেকে যন্ত্রদানবের গর্জনে তাড়া খেয়ে বাসস্থান হারিয়ে ফিরছে আশ্রয়ের আশায়, ওই শিয়াল হুড়ারের দলও যাই যাই এ বন থেকে পালাতে পারে নি। কিসের মায়ায় যেন টিকে রয়েছে আজও। পলাতকের মত এখান ওখানে ঘুরছে আশ্রয়ের আশায়।

তাদেরই পরিত্যক্ত বাড়ীর পিছনের জঙ্গলের নির্জনে পুবমজা দিঘীর ধারে আমবাগানের গভীর তরকারিক্ষেতের আগাছার জঙ্গলে গর্ত খুঁড়ে আশ্রয় নিয়েছে বনতাড়ানো কয়েকটা খেঁকশিয়াল।

ঝিঁঝি ডাকছে; গাছগাছালির মাথায় তিরি তিরি জোনাকি জ্বলে মিট মিট করে। বন্দীপুরে রাত্রি নামে—এখনও এই সামান্য ঠাঁইটুকুতে নামে আদিম তমসাচ্ছন্ন রাত্রি, প্রতাপনারায়ণের এইটুকুই রাজ্য।

বসন্তের কথা মনে পড়ে প্রদীপের। একটা জায়গাতে বসন্তকে স্বীকার না করে পারেনি। সেই মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধছাড়া বইখানার কথা মনে পড়ে।

এমনি করেই সমাজব্যবস্থা বদলায়—আমূল পরিবর্তিত হয়। যুগ থেকে যুগান্তর আসে। তেমনি একটি পরম যুগসন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়েছে প্রদীপ, প্রত্যক্ষ করছে সেই ওলটপালটকে।

বিক্রমনারায়ণ—নবনী মিত্র—পটলকে দেখেছে, দেখেছে লাখপতি

শেঠজী ভালোটিয়াকে ; সেই সঙ্গে মাঝের স্তরে গজিয়ে উঠেছে নটবর। ক্রমশঃ দেশনেতার ভূমিকা নিয়েছে তারা। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি সে আজ।

দেখেছে ভোলা মাঝি, অনুকূল ডোমদের মত শ্রেণীকে। প্রতাপনারায়ণের মনের ঝাড়ও দেখছে।

কিন্তু তার ? তার পরিবর্তনটাকে লক্ষ্য করতে পারেনি নিজে। তবু মনে হয় একটা ভিন্ন পথে সে চলেছে—চলতে বাধ্য হবে সে—গতানুগতিক সেই চিরাচরিত পথ থেকে অন্য পথে।

পরদিনই নটবর মুখুয্যের সঙ্গে দেখা ; কথা কইবার মত সময় নটবরের নেই। কালীপুরের হাটতলায় ফাঁকা মাঠটা লোকের ভিড়ে ভরে উঠেছে। হাটের লোকজন—দূর গ্রামের তরকারি-আনা ফড়ে মহাজন—ওপারের চাষী ছেলেমেয়ের দল শূন্য তরকারির বজরা নামিয়ে রেখে কি যেন কথকতা শুনতে বসেছে। এসে জমায়েত হয়েছে স্টেশন প্লাটফরম থেকে চাকরির খোঁজে আসা দূরদূরান্তর থেকে বহু ছেলে ; এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লাইন দিয়ে নাম রেজেস্ট্রী করাতে আসে দিনান্তে ছ' পাঁচশো ছাত্র যুবক। তারাও এসে জমায়েত হয়েছে নটবর মুখুয্যের বক্তৃতা শুনতে। চারিদিকে ভিড় জমে উঠছে। নেতারা তখনও আসেনি। কলরব উঠছে জমায়েত জনতার।

শ' দরুনে লোককে কাজে নেওয়া হচ্ছে এখানের বিভিন্ন কাজে। অসংখ্য ঠিকেদারী ফার্ম—লোহাকারখানা—অন্যান্য ব্যাপারে কাজের সন্ধানে আসছে তারা, ধরনা দিচ্ছে সর্বত্র। কিন্তু কোন আশার আলোই দেখে না তারা। রীতিমত পরীক্ষাও হচ্ছে কিন্তু লোক আসছে অন্য সব প্রদেশ থেকে। এই নিয়ে কাগজপত্রেও তুমুল আন্দোলন চলেছে। আন্দোলন চলেছে স্থানীয় লোকদের মধ্যে।

নটবর মুখুয্যে তাদেরই চাপে আজ বক্তৃতা দিতে আসছে। এ

ব্যাপারের তদন্ত করা হবে। সব ব্যবস্থা হবে এইবার, চাকরী পাবে ওরা।

প্রদীপও এসে জুটেছে। একপাশে অপরিচিতের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেও। কে যেন বলে ওঠে—

—দু'দিন ধরে ঘুরছি দাদা। চেনাশোনা কেউ না থাকলে চাকরি এখানে হবে না।

ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে প্রদীপ। শুকনো মুখ-চোখ। দু'দিন বাইরে কোথাও নেয়ে কোন হোটেলে খেয়ে প্লাটফরমে পড়ে থেকে রাত কাটিয়েছে এদের অনেকেই। রাত্রে তাই স্টেশনে এত ভিড় জমে। ওদের ভিড়।

কে প্রশ্ন করে—নটবরবাবুর বাড়িতে দেখা করলে সুবিধা হবে স্যার ? শুনেছি নাকি ভালো লোক। যে কোন একটা ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়ে দিতে পারেন।

প্রদীপ কথা বলে না। কি জবাব দেবে। চুপ করে সরে এল সেখান থেকে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে জনতা এখনও কর্তাদের দেখা নেই। গুঞ্জনধ্বনি উঠেছে।

হঠাৎ কাকে ডায়াসে উঠতে দেখে একটু আশ্বস্ত হয় লোকজন। একগলা ফুলের মালায় নটবর মুখুয্যে যেন ঢাকা পড়ে গেছে। এইমাত্র স্থানীয় ঠিকাদার, কারখানার কর্ম-কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আসছে—তাতেই এই মিটিংএ আসতে দেরি হয়ে গেছে। তার জন্য সকলের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমাও চাইল।

আশাভরে চেয়ে থাকে বুভুক্ষু জনতা ওর দিকে। ক'বছরেই শীর্ণ প্যাকাটির মত লোকটা শাঁসে জলে ফুলে উঠেছে। বেশ জোরদার কণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছে এ মাটিতে এদের সকলের অধিকার—জন্মগত দাবির কথা।

হাততালির শব্দে ফেটে পড়ে সভামণ্ডপ। নটবর মুখুয্যে ঘোষণা করে, বীরদর্পে—

—কর্তৃপক্ষ রাজী হয়েছেন স্থানীয় লোকদের চাকরির কথা বিবেচনা করতে। আমরা আলোচনায় জয়ী হয়েছি।

অর্থাৎ মাভৈঃ সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে। কে যেন জয়ধ্বনি করে ওঠে।

এর পরই সভাভঙ্গ হয়। লোকজন কলরব কোলাহল করে চলেছে, মুখে তাদের আশার আলো। নটবর মুখুয্যে গিয়ে বাইরের গাড়িতে উঠে আগেই বের হয়ে গেছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রদীপ ওই চলমান জনস্রোতের ধারে। বেশ অনুমান করে সে, শ্রেফ স্তোকবাক্য দিয়ে হাততালি নিয়ে গেল নটবর। এর ফলাফল বিচার করে আবার কোন আন্দোলন শুরু হতে যে সময় লাগবে তার মধ্যে আবার কোন কৈফিয়ত তৈরি করে নেবে ধূর্ত ওই নটবর। একটা প্রবল জনমত—সুষ্ঠু যুক্তি-সংগত আন্দোলনকে এমনি করে ব্যর্থ করে দিয়ে গেল। বঞ্চিত করে গেল এতগুলো লোককে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে।

বের হয়ে আসছে বন্দীপুরের দিকে একা। করঞ্জপাড়ার ধারে এসে দাঁড়াল। মাঠের মধ্যে কয়েকটি পাঞ্জাবী ঠিকেদারের আস্তানা। ইলেকট্রিক লাইন টেনে নিয়ে গিয়ে তারা নিজেরাই গড়ে তুলেছে একটা ছোটখাটো কারখানা; ড্রিল, লেদমেসিন চলছে। সারিবন্দী কতকগুলো গাড়ি দাঁড় করানো একটা ঝকঝকে পেট্রল পাম্পের সামনে। এখন ওদেরই রাজত্ব।

ওদিকের ফাঁকা মাঠগুলোয় তৈরী হয়েছে সারিবন্দী বাড়ি। নতুন ফ্যাসানের একটা বাড়ি দেখে দাঁড়াল। রেডিও বাজছে। পুরোনো টিনের চালাটা এখনও দাঁড়িয়ে একপাশে। অতীতের ওই একটুকুই স্মরণ চিহ্ন।

নায়েকবৌএর ইতিহাস এখনও করঞ্জপাড়া কালীপুর—এ চাকলার পুরোনো বাসিন্দারা জানে। জানে কেমন করে প্রতাপ-

নারায়ণ ওর হারানো সম্পত্তি নটবরের হাত থেকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে হন্যে কুকুরের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। সেই নায়েকবৌ আজ কালীপুরের মধ্যে অন্যতম বড় বাড়ির মালিক। সমস্ত ফাঁকা জায়গাতে বাড়ি তুলে বেশ মোটা টাকায় ভাড়া দিয়েছে। যেতে যেতে প্রদীপ কার ডাকে দাঁড়াল।

—মা আপনাকে ডাকছেন।

প্রদীপকে ডাকছে এবাড়ির ঝি-ই হবে বোধ হয়। ইতস্ততঃ করে প্রদীপ। যাবে কিনা ভাবছে। ঝিই বলে ওঠে—

—আসুন।

কি ভেবে ভিতরে ঢুকলো প্রদীপ।

হালকা নীল ডিসটেম্পার করা ঘরখানার ওপাশে ঝকঝকে সোফা সেট বসানো। সামনে মার্বেলটপ টিপয়; কয়েকটা নেতাদের ছবি। ওদিকে বিশ্রী বিদেশী ছবির একটা কপি। দেখেই চোখ নামিয়ে নিল প্রদীপ। এই ছবিগুলোর পাশে কোন্ রুচিতে ওই কদর্য ছবিখানা টাঙানো হয়েছে ঠিক বুঝতে পারে না সে।

ওদিকের পর্দা ঠেলে একটি মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলাকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। সহজভাবেই কথা বলে ভদ্রমহিলা—

—বসো। তুমিই বললাম, মনে কিছু করো না।

প্রদীপ অবাক হয়ে থাকে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে আজকের কালীপুরের রূপ। কুঁকড়েপড়া শুকনো বনপ্রান্তে কালো মলিন ভয়চকিত কয়েকটি ঘর নিয়ে যে বসত রাতারাতি যৌবনবতী লাস্যময়ী রূপসী কোন্ সভ্য শহরে পরিণত হয়েছে তারই কথা। একটু অবাক হয়েছে।

সেদিনের নায়েকবৌ আজ কালীপুরের সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে গেছে। সেই বঞ্চিতা মেয়েটি পথে পথে ঘুরেছে এতদিন—আজ যেন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এইখানের জীবন যাত্রার সুরে সুর মিলিয়েছে আজ।

ঝি প্লেটভর্তি খাবার এনে টিপয়টা টেনে তার উপর সাজিয়ে দেয় বিদেশী কাট গ্লাসে করে এনেছে কাঁচধার ঠাণ্ডা জল, দামী ফ্রিজেডিয়ার থেকে সদ্য বের করে এনেছে। গ্লাসের গায়ে হিমজল কণা জমে আছে।

হঠাৎ বাইরে গাড়ি থামার শব্দে চেয়ে দেখে প্রদীপ—লক্ষ্মীও উঠে দাঁড়িয়েছে কোন মানী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে। এগিয়ে যায় ওই দিকে।

দরজা দিয়ে ঢুকছে নটবর মুখুয্যে। ইতিমধ্যে পোশাক পরিবর্তন করে এসেছে। পরনে মিহি কাঁচি ধুতি—কড়া চুনোট করা, গিলেলাগানো পাঞ্জাবি, পায়ে গ্লেজকিড চামড়ার দামী পাম্পস্থ।

এরই মধ্যে মিটিং থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে পোষাক বদলে এসেছে।

—এখনও তৈরী হওনি?

হঠাৎ প্রদীপের দিকে চোখ পড়তেই একটু চমকে ওঠে নটবর—এক মুহূর্ত মাত্র, পরক্ষণেই নিপুণ অভিনেতার মত মুখভাব বদলে সহজ করে এগিয়ে আসে।

প্রদীপকে এখানে দেখে যেন খুশীতে উপছে ওঠে—আরে তুমি! ইস্ কতবড় হয়ে গেছো। শুনলাম আই, এস্-সিতে স্ট্যাণ্ড করেছো। এবার বি, এস্-সিতে ও স্ট্যাণ্ড করতে হবে। তোমরা এ অঞ্চলের গৌরব। বংশের গৌরব।

প্রদীপের চোখে এতক্ষণে লক্ষ্মীর এই ঐশ্বর্যের মূল কারণটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। কোত্থেকে এত পয়সা বিলাসিতার আয়োজন আসছে অনুমান করতে দেরি হয় না। নায়কবৌ আজ ওদের দলে নাম লিখিয়েছে। কালীপুরের ইতিহাসেও একটি জীবন্ত চরিত্র। দুহাতে আজ পয়সা পেয়েছে। প্রচুর পয়সা।

অনা ডোমের অনাহারক্লিষ্ট চেহারাখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে—ওই চাকরি-অন্বেষী জনতার বুভুক্ষু রাত্রিজাগা

চেহারাগুলো মনে পড়ে। কেমন অসহ্য ঠেকে এই পরিবেশ। প্রদীপের কাছে।

—ও কি, উঠছো যে? খাও, মুখে দাও কিছু। লক্ষ্মী শশব্যস্ত হয়ে ওঠে ওকে উঠে পড়তে দেখে। প্রদীপ ওর অনুরোধে জলের গ্লাসটা তুলে নেয়, এতক্ষণ ঘুরে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল—গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

নটবর মুখুয্যে ওর দিকে চেয়ে আছে—কি যেন দেখছে ওর সুগৌর ফরসা মুখের প্রতিটি মাংসপেশীর নীরব কুঞ্চনে।

এখানের পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠেছে প্রদীপের কাছে।

প্রদীপ বলে ওঠে—চলি।

গাড়ি আছে পৌঁছে দিয়ে আসুক। রাত্রি হয়ে গেছে। লক্ষ্মী বলে ওঠে।

নটবরের এই অযাচিত আতিথেয়তাটা ঠিক ভাল লাগে না। চুপ করেই থাকে। কোন সমর্থন না করে।

জবাব দেয় প্রদীপ—হেঁটেই চলে যাবো এইটুকু পথ।

নেমে গেল দরজা পার হয়ে রাস্তার দিকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ্মী। কি যেন একটা আঘাত সে পেয়েছে। নটবরের কথায় ফিরে চাইল—কেন গেলে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে? সব গেছে ওদের ওইটুকুই যায়নি। যাবে এইবার।

নটবর সেদিনের লাঞ্ছনাটা আজও ভোলেনি, পুরোনো ঘা-টা যেন দগদগে হয়ে উঠেছে—সহসা সেইখানেই ব্যথা পেয়ে আবার যন্ত্রণাটা বেড়ে উঠেছে।

লক্ষ্মী জবাব দেয়—বাঘের বাচ্ছা বাঘই হয়।

নটবর কথা বলে না, আধপোড়া সিগারেটে জোর জোর কয়েকটা টান দিয়ে জ্বলন্ত আগুনটাকে মেজেতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে নিভিয়ে দিল।

প্রদীপ চলেছে আবছা আলোঢাকা রাস্তা দিয়ে। বাঁ পাশের বনভূমি এখনও নির্মূল হয়নি। বর্ষার শেষ—শরতের প্রারম্ভ। তার কোন চিহ্নই আর এখানের জমিতে নেই। দু'পাশের ধানক্ষেত নিঃশেষ হয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায় ইট কাঠ আর কন্‌ক্রিটের দেওয়াল। সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই।

তবু ওপাশের বনের দিক থেকে ভেসে আসে বৃষ্টির জল পেয়ে সদ্যফোটা কুর্চিফুলের সৌরভ, মাঠের মধ্যে রাস্তার নীচে জল জমে তাতে মাথা তুলেছে এত নিষেধ সত্ত্বেও দু'একটা শালুক-শাপলা ফুল—এক ফালি চাঁদের ভীরু আলো এসে ছোঁয়া দিয়েছে তার বুকে। আবার রাস্তার লাইটপোস্টের গা থেকে ঠিকরেপড়া বিজলীর আভায় তা কোন্ দিকে হারিয়ে গেছে। প্রদীপ আজ স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে কালীপুরের অন্তরসত্তাকে আবিষ্কার করেছে।

মিলছে, বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে সব লক্ষণগুলোই পরিষ্কার দুটো শ্রেণী আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে শোষিত আর শাসক। সদ্য-গজানো শাসক সুবিধাবাদী শ্রেণী যাদের মনে সুন্দর মানবিকতার কোন স্পর্শ টুকুও নেই।

তাই সমাজ—কালীপুরের সমাজ আজ অমানুষের প্রতাপে ভরে উঠেছে—হৃদয়ের কোন স্পর্শই এখানে নেই।

একটা রাতজাগা পাখী একবার ডেকে থেমে গেল। কোন সুরই এখানে ওঠে না, উঠলেও থেমে যায় কোন্ অজানা আতঙ্কে।

একটা পথ যেন পেয়েছে সে। কালীপুরের ওই নীচেকার সমাজকে ঘৃণা করে না সে—আজ দুঃখ হয় অনুকূলদের জন্য। ঘৃণা করে সে লক্ষ্মী নায়েক—নটবরের দলকে। এদের উপরের স্তরের বিক্রমনারায়ণ—নবীন মিত্র—তার উপরে শেঠ ভালোটিয়াকেও।

অনুপ্রবেশ করেছে তারা কারখানায় মালিকানায়—লুঠছে বেশী তারাই; নটবর লক্ষ্মীর দল তাদের চাকাটা চালু রাখবার জন্য

প্রাণপাত করে চলেছে—বিনিময়ে তারা পায় অনেক কিছু। পরিশ্রম দালালী হিসাবে।

বসন্তের কথা মনে পড়ে। কি যেন নতুন চোখে আজকের কালীপুরকে খেতে শিখিয়েছে সেই-ই। প্রতাপনারায়ণের জন্য দুঃখ হয়। সেই স্রোতে সে ভেসে যাবে, মুছে যাবে নিঃশেষে। এখন নিষ্ঠুর সত্য।

সীতা ছেলেকে রাত্রি করে বাড়ি ফিরতে দেখে আশ্চর্য হয়—এতক্ষণ কোথায় ছিলি? আমি তো ভেবে সারা। চল খেয়ে নিবি।

রাঁধুনঠাকুরও বিদায় নিয়েছে আগেই। টিকে আছে বহুদিনের বুড়ো চাকর গুপী। তার আর অন্য কোথাও কোন দাম নেই, যাবার জায়গাও নেই। তাই এই ধ্বংসপুরীর মাঝে সেও অতীতের গৌরবের স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে। আর টিকে আছে সীতার বাপের আমলের পুরোনো ঝি।

এতবড় বাড়ীটায় এই কটি প্রাণী যেন গভীর নির্জনে কোথায় হারিয়ে গেছে।

রাত্রির অন্ধকারে তারাও শুয়ে পড়েছে। সীতা ছেলেকে খেতে দিয়েছে। প্রদীপ বলে ওঠে—

—বাবা খাবেন না?

—ওঁর খাওয়া হয়েছে। শুধু দুধ খান রাত্রে এখন।

কেমন যেন কথাটা বলে চুপ করে যায় সীতা। প্রতাপ নারায়ণের আহার ছিল এ অঞ্চলের গল্প কথা। রোজ এক সের মাংস—সন্ধ্যায় সেরখানেক কাঁচাগোল্লা, আড়াই সের দুধ ছিল বন্দোবস্ত। আজ!

প্রদীপও বুঝতে পারে ব্যাপারটা। চুপ করে ভাত নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে কেমন অসহায় কণ্ঠে—

—কালই কলকাতায় ফিরে যাবো মা, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।

—কালই যাবি? ছেলের কথারই যেন পুনরাবৃত্তি করছে। সীতা।

মাথা নাড়ে মাত্র, কথা বলে না প্রদীপ। মা ছেলের দিকে থাকে। ক'দিনে প্রদীপ এখানে এসে যেন বদলে গেছে। ঠিক নিজের ছেলেকেও চিনতে পারে না আজ সীতা। এই দুরন্ত পরিবর্তনের মাঝে।

অবিনাশবাবু ঠিক এটা চাননি—অভাব-অনটন সব সংসারেই আছে, নতুন কিছু নয়। তাই বলে মেয়ে চাকরি করতে যাবে কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র এটা ঠিক চাননি। নতুন জায়গা, এখনও সেখানে বন কেটে বসত চলেছে। মেয়েকে সেখানে পাঠাতে মন চায় না। মনোরমাও মেয়ের উপর চাপা অভিমানে গুম হয়ে উঠেছে। আজকালকার মেয়েদের মন বোঝা ভার। একদিন কি একটা কথা-কাটাকাটির ফল যে এতদূর গড়াবে তা ভাবতে পারেনি। শীলা মায়ের সেই কথায় রাগ করেই এসব করেছে।

কলকাতায় বেশ কয়েক বৎসর একসঙ্গে থেকে শীলা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। শিক্ষা ও পেয়েছে বাইরের জগতে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করে স্বাদ পেয়েছে মুক্ত অবাধ জীবনের। সেই একরাত্রের, মায়ের কথাগুলো ভুলতে পারেনি। মধ্যবিত্ত সংসারের সমস্যাটা বড় করে দেখেছে সে। মায়ের সেই কথার পর নিজেও ভেবে দেখেছে সবকিছু, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তাকে। তাই চাকরির সন্ধানেই বের হয়। চাকরিও জুটে গেছে—কালীপুর স্টীল ওয়ার্কস অপিসে একটা কেরানীগিরি—বানের মুখে খড়কুটো ভাসতে ভাসতে যে তীরে লাগে লাগুক গোছের ব্যাপার। তাই নিয়ে বসেছে সে।

অনেকে অনেক কথা বলে। অচেনা অজানা জায়গা—নিজেও ছেলেবেলায় দেখেছে কালীপুরকে—আবছা মনে পড়ে জঙ্গল আর পাহাড়ী কাঁকুরে লাল ডাঙ্গা। অনেক অসুবিধা হবে—তবুও চলে

যাবে সে। তারই গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত। জীবনকে ভাল করেই দেখবে কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তার মন থেকে মুছে গেছে। এ জগতে প্রেম আর প্রয়োজনের মধ্যে কোন আপোষ নেই। কোন ঠাঁই নেই প্রেমের হৃদয়বৃত্তির। এই কথাটাই শীলা আজ পরম সত্য মনে করছে।

শেষ পর্যন্ত মনোরমা বলে ওঠে—যাবি তাহলে ?

—হ্যাঁ। প্রথমে যাই ওখানে। পরে চেষ্টা করে এখানে এদের হেড অপিসে আসতে পারবো মনে হয়।

মনোরমা চুপ করে থাকে, শীলা স্যুটকেশে শাড়ি টুকিটাকি জিনিসপত্র পুরছে। মায়ের কথায় ফিরে চাইল।

মা বেদনাভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—

—শেষকালে আমার কথায় রাগ করেই যাচ্ছিস ? তোর ভালোর জন্যই বলেছিলাম কথাটা।

শীলা স্যুটকেশ গোছানো বন্ধ রেখে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে ; মাকে আঘাত দেবার ইচ্ছে তার ছিল না—নেইও। কিন্তু এ ছাড়া পথ কই। সেও পরে বুঝে দেখেছে প্রদীপকে জড়াতে চায় না। তাই তার কাছ থেকে দূরেই চলে যাবে—ভিড়ের মধ্যে যেখানে প্রদীপ তাকে খুঁজেও পাবে না। এড়িয়ে যাবে প্রদীপকে।

শীলা জবাব দেয়—তাইতো দূরে যাচ্ছি মা। এখানে থেকে তোমার কথাটা মানা সম্ভব হতো না। মানবো বলেই সরে গেলাম।

মনোরমা কথা বলে না—মেয়ের বেদনাভরা কণ্ঠের কথাগুলো শুনে সেও যেন চমকে উঠেছে।

শীলা বলে চলেছে—নইলে তোমাকে ছেড়ে যেতাম না, কোনদিনই না।

মা মেয়ের মাঝখানের এই ক'দিনে গড়ে ওঠা কাল্পনিক বিরোধের পাঁচিলটা মাটিতে মিশিয়ে গেছে। শীলা মায়ের দিকে

চেয়ে থাকে—মনোরমার চোখ বিদায়ব্যথায় ছলছল হয়ে ওঠে। তার মেয়েকেও যেন চিনতে পারে না। কোথায় আজ শীলা হারিয়ে গেল অজানা জগতে।

কয়েক দিন পরই প্রদীপ ফিরে এসেছে কলকাতায়। বসন্তই প্রথম্ অভ্যর্থনা জানায়—কি রে রাগ পড়লো ?

হোল্ডঅলটা খুলে তক্তপোশে মেলতে মেলতে জবাব দেয় প্রদীপ—রাগ কিসের ?

হাসে বসন্ত—তুই ভয়ানক সেন্টিমেন্টাল। কোথায় কি একটা কথা হলো আর অমনি রেগে উঠে সটান সেই রাত্রেই পাড়ি দিলি।

প্রদীপ ওর কথার জবাব দেয়না। কি যেন ভাবছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সহজে ঘটে গেছে। আর তার থেকে ফুটে বের হয়েছে প্রদীপের মনের ব্যর্থতার অসহায় জ্বালা। আজ বিরাট বিশ্বের মাঝে দেখেছে তার মূল্যহীনতা।

আজ স্বীকার করে প্রদীপ—ভুল করেছিলাম। নে পড়া কতদূর এগোল বল ? এদিকে অনার্স নিয়ে বসে আছি শেষতক অনার থাকলে হয়।

রীতিমত পড়াশোনার তোড়জোড় করে প্রদীপ।

সেদিন বৈকালে কি যেন নেশার ঘোরেই এগিয়ে চলে ভবানীপুরের দিকে। ক'দিন কলেজ স্ট্রীটে ওর কলেজের আশপাশে খোঁজ করেছে শীলার, তেমনি কমলালেবু রঙের শাড়ি—সেই বলিষ্ঠ সুঠাম দেহটার ছবি খুঁজেছে পথে পথে—কিন্তু কোথাও দেখা পায়নি তার। ক'দিনের তিল তিল কামনা আজ যেন জোর করেই তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ওই দিকে।

গলির মোড়ে হলদে রঙের বৃষ্টিধোয়া দোতলা বাড়িখানা তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কড়া নাড়তেই বের হয়ে আসবে দরজা খুলে চঞ্চল একটি মেয়ে। দু'চোখে হাসির আভা—ওকে

দেখেই উপছে পড়বে খুশীর জোয়ারে। কি যেন উৎকণ্ঠা আর আগ্রহ নিয়ে গিয়ে ফের ওদের বাড়ীতে পৌঁছল প্রদীপ।

—কে?

কড়া নাড়তে মনোরমাই সাড়া দেয় ভিতর থেকে। বাইরে রাস্তা থেকে তত জোরে সাড়া দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে লজ্জা আসে তার। কড়াটাই নাড়তে থাকে।

মনোরমা দরজা খুলে প্রদীপকে দেখবে কল্পনাও করেনি। সামনেই অবাঞ্ছিতের মত তাকে দেখে একটু চমকে ওঠে। ধাক্কাটা সামাল নিয়ে ওকে আহ্বান জানায়—

—এসো বাবা।

বাইরের ঘরে বসালো তাকে। প্রদীপ মনোরমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। ক'দিনেই যেন ওর বয়সটা বেশ বেড়ে গেছে। চোখের কোলে জমাট কালির দাগ প্রকট হয়ে উঠেছে। জানলা দিয়ে ভিতরের বারান্দায় কার পায়ের শব্দের সন্ধান করতে থাকে।

কিন্তু নিস্ফল সেই সন্ধান। মনোরমাই চা নিয়ে আসে। মরীয়া হয়ে প্রদীপ কথাটা বলে ফেলে—

—শীলা কলেজ থেকে এখনও ফেরেনি?

মনোরমা স্থিরকণ্ঠে জবাব দেয়—সে এখানে নেই। বাইরে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

চমকে ওঠে প্রদীপ—কলকাতার বাইরে?

হ্যাঁ। ছোট্ট জবাব দেয় মনোরমা।

সব কিছু আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসে প্রদীপের চোখের সামনে। একটা দিক শূন্য হয়ে যায়; মনের একটুকু সবুজ ঠাঁই যেন কঠিন কঠোর রোদে পুড়ে আংরা হয়ে গেছে।

চুপ করে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দেবার চেষ্টা করে। ওর মুখ-চোখের এই পরিবর্তন মনোরমার নজর এড়ায় না।

এখানে আসাও যেন অবাস্তর বলে মনে হয়, এই শূন্য রিক্ত বাড়িখানার আর কোন আকর্ষণ তার কাছে নেই। চুপ করে রাস্তায় বের হয়ে আসে প্রদীপ।

চারিদিকে দিনের আলোটুকুও কেমন ম্লান বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

অপিস-ফেরতা ট্রাম—আকণ্ঠবোঝাই হয়ে চলেছে দক্ষিণ সীমান্তের দিকে। দলে দলে ফিরছে ক্লান্ত কেরানী, স্ত্রী পুরুষ সকলেই। লেকের জলে আবছা অন্ধকার নেমেছে। ঘাসে ঘাসে শরতের প্রথম কুয়াসার আস্তরণ। প্রদীপ চুপ করে বসে থাকে।

আজ জীবিকার তাগিদে অনেকেই বের হয়েছে—ট্রামে বাসে অপিসে তাদের অনেককেই দেখেছে। কাজের চাপে ভালবাসা প্রেম নামক বস্তুটি আজ কল্পনায় পরিণত হয়েছে। শীলা তাই চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এই চরম নির্বাসনে।

কেমন যেন বেসুরো ঠেকে সবকিছু, নিঃস্ব ব্যর্থ একটা কালো ছায়া মনের সব খুশির আলোকে ঢেকে দিয়েছে—আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করেছে অকাল রাহুর প্রবল বুভুক্ষা।

তবু বাঁচতে হবে। বাবার সেই স্তব্ধগম্ভীর মূর্তির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মায়ের করুণ বিষন্ন একটু হাসির বেদনার্ত চাহনি—অনা ডোম ভোলা মাঝিদের কথা—শীলার প্রেমের এই নিঃশেষ অবলুপ্তি; নটবর মুখুয্যে—লক্ষ্মী বৌএর লাস্যময় বিলাসব্যসনের জীবন—পটলা মিত্তিরের লুটে বড়লোক হওয়ার কথা।

একদিকে চলেছে শোষণ পেষণ—অন্যদিকে চাকার উপরে বসে ওরা জীবনের সব সুখসম্পদের মুঠো মুঠো অপচয় করছে। প্রদীপ নিজেও আজ সেই অপচয়ের দলে—নিজে বাঁচবার, বাঁচাবার কোন ক্ষমতাই তার নেই।

শীলার কথা, নিজের ছোট্ট চাওয়া-পাওয়ার কথা যেন মন থেকে মুছে গেছে তার; মুক্ত উদার তারাকিনী রাত্রের উজ্জ্বল আকাশের দিকে চেয়ে নিজের ছোট দুঃখকে ভুলে যায় সে।

দমকা বাতাসে উঠেছে মৌন ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাস—সর্বংসহা সে তবু রাত্রিনিশীথে আকাশ-বাতাসে ওঠে তার বেদনার বুকভরা কান্না—প্রদীপ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ওই ক্রন্দসীর তারার পানে।

তার শীলা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। শীলাময় কুসুমিত যৌবনের নিদারুণ অপমৃত্যু ঘটেছে কঠিন বাস্তব জগতের পাথরের পথে নিষ্ফল মাথা খুঁড়ে।

বসন্ত প্রদীপের হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে একটু বিস্মিত হয়; আগেকার সেই প্রথম-আসা ছেলেটির মত প্রদীপ আবার হোস্টেলের কোণে আশ্রয় নিয়েছে। দিনরাত ডুবে আছে পড়ার মধ্যে। কলেজের বই ছাড়াও রাজ্যের বই কিনে আনে—আনে লাইব্রেরী থেকে, তাতেই ডুবে রয়েছে। বসন্তও বিস্মিত হয় ওর এই পরিবর্তনে।

—এত কি পড়িস দিনরাত? হ্যাঁরে?

প্রদীপ হাসে—পড়তে গেলে দিনরাতের কি ঠিক থাকে—পড়তেই হয়। আর এ ছাড়া করবই বা কি বল?

শীলা চলে যাবার পর থেকে প্রদীপ বদলে গেছে। মুখ ফুটে কোন কথাই কোনদিন বলে না প্রদীপ—স্বভাবই গম্ভীর প্রকৃতির—বসন্তও এ নিয়ে কথা তোলে না।

আয়তন আকারপ্রকার বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে কালীপুরে। ওগুলো আনুষঙ্গিক ব্যাপার। বিক্রমনারায়ণের কারখানায় দেখা দিয়েছে গোলমাল। গোলমালটা অনেকদিন থেকেই ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠছিল, চাপা পড়ছিল কঠিন শাসন আর জুলুমের চোটে; দু'হাতে পয়সা রোজগার করবে নবনী বিক্রম কোম্পানি। দিনরাত তিন শিফ্‌টে কাজ করে—মজুরদের বাড়তি পয়সার লোভ দেখিয়ে খাটিয়ে নিয়ে মাল যোগান দিয়েছে। মজুররা

বেশী মাইনে বোনাসের দাবি করেছে যখনই—তাই নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়েছে। বেশ কিছু দরদস্তুরের পর বিক্রমনারায়ণ ওদের মধ্যে দয়া করে দশ পাঁচ টাকা হিসাবে ছিটিয়ে দিয়েছে। বার বার এমনি করেই দাবিয়ে দিয়েছে ওদের কণ্ঠস্বর। এতদিন সেই ভাবেই চলেছে।

আর যেন পেরে ওঠে না। কয়েকশো মজুর সবে তখন নতুন কলে কাজ করতে এসেছে, নগদ পয়সার লোভে চাষবাস ছেড়ে দিয়ে এসেছিল এই পথে অনেক আশা নিয়ে। চাষ করে পেত বৎসরান্তে খাবার সংস্থান—মাথা গোঁজার একটু আশ্রয়; যার বাড়িতে চাষ করতো দেখেছে সেখানে মনিব যদি খেতে পেয়েছে মুনিষও একমুঠো তার ভাগ থেকে কোনদিনই বঞ্চিত হয়নি।

কিন্তু এ যেন আলাদা জগৎ। তুমি মরো-বাচো মানবিকতার কোন দাম নেই, সমন্ধ নেই। খাটো মাইনে পাবে—না খাটো কোন মাইনেও নেই, সম্পর্কও নেই।

দুগাইলোহার আজ সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয় ওদের। ঢালাইঘরের হেডমিস্ত্রী। এর আগে জগন্নাথপুরের হাটতলার ধারে ছিল তাদের পুরষানুক্রমে কামারশাল। বড় বটগাছের নীচে হাটের ধারে বসতো তার হাপরখানা। বাইরে জমা হয়েছে ভিন গ্রামের চাষীর দল। কেউ এসেছে গাড়ির চাকার হাল বসাতে, কেউ এনেছে মুনিববাড়ির দুখানা কুঠার পাঁজাবে বলে, কেউ আনে ধানকাটার আগে কয়েক গণ্ডা কাস্তে, দাঁত পাঁজিয়ে নিয়ে যাবে। শালের আগুন থেকে আংরা তুলে কলকেতে চাপিয়েছে, হাতে হাতে ঘুরেছে সেই কলকে। সুখ-দুঃখের কথা আলাপ করেছে নিজেরা, আষাঢ়ের প্রথম আকাশ মেঘের আস্তরণ না দেখে শূন্যে দৃষ্টি মেলে আকুতি জানিয়েছে—

—একবার ঝেঁপে আয় বাবা, লাগভেল্কি দেখিয়ে দিই। বীজ-ধান যে কটাই গেল বাপ!

আবার চাষের শেষে নিশ্চিন্ত আরামে হাটতলায় এসে খোশ-গল্প

জুড়েছে। যতদূর চোখ যায় ঢালু ক্ষেতে সবুজের আবরণ—বাতাসে ঢেউ ওঠা ঘন সবুজ সেই রং—চোখ জুড়িয়ে যায়।

—মুনিব ইবার বৌএর পঁইছি গড়িয়ে দিবেক বলেছে ধানকাটা হলেই। বুঝ্‌লা দুগাই কাকা।

কতদিনের স্মৃতি। দুগাইলোহার কি এক মরীচিকার মোহে সেই সবুজ মিষ্টি পরিবেশ ছেড়ে এসেছিল চিনকুঠীতে কাজ নিয়ে। এখানে সেই আত্মিকতার কোন স্পর্শ নেই। শুধুমাত্র কয়েকটা টাকা—তাও ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না; অথচ দেখেছে তার পরিশ্রমে ঢালাই-করা মালের কি দর পেয়েছে কোম্পানি, তাকে দিয়েছে কত—আর তারা নিয়েছে কত। তাই দাবী জানায় এবার কঠিন কণ্ঠে—

—মাইনে বাড়াতে হবেক ইবার।

ভোলা মাঝি চুপ করে বসে থাকে। বসে আছে আরও অনেকেই। তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। হঠাৎ অনুকূলই বলে ওঠে—কাজ বন্ধ করতে পারবি তুরা? দেখ বড়-হুজুরের বাপ দিবেক তুদিকে টাকা। অনুকূল কথাবার্তা কাকুতি মিননিতে বিশ্বাস করে না। তার চাই কাজ। আঘাত করো প্রচণ্ড ভাবে। তাই সোজা পথই বাত্‌লে দেয় সে।

দুগাই বলে ওঠে—কেনে লারবো, কাজ যায় কামারের ছেলে শাল পিটিয়ে খাবো। তিন টাকা রোজ মারে কে?

ওদিক থেকে অনেকেই সায় দেয়—ঠিক আছে। বর্ষার সময় দেশ গেরামে গিয়ে চাষে খাটবো দুটো মাস, উ কাজ করা অভ্যেস আছে। ইবার না হয় বাদাই খাঁটবো।

অনা ডোমই মাথা তোলে প্রথম, দুর্ধর্ষ সেই বাঘশিকারী অনুকূল। কালো মুষকো চেহারা—খেটে খেটে আরও মজবুত হয়ে উঠেছে শরীরের পেশীগুলো—দেখেছে অনেক। সেইই বলিষ্ঠকণ্ঠে কালীপুরের আকাশে প্রথম প্রতিবাদের গর্জন তোলে।

—মাইনে বাড়াতে হবেক। আরও বেশী মাইনে চাই।

একক কণ্ঠের সেই বলিষ্ঠ চীৎকার শুনে চমকে ওঠে সকলেই; ক্রমশঃ তার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায় বহু শ্রমিক।

নীরব নিস্তব্ধ আকাশ চিমনির ধোঁয়া উঠছে—যেন মাটির বুক থেকে বের হয়ে আসছে কলুষ ক্লেদ—তার সঙ্গে মিশে গেছে ওদের কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ।

সেদিন কালীপুরের লোক অবাক হয়ে চেয়ে দেখে হাজারো ধুলো কাদামাখা চিত্রবিচিত্র ছেঁড়া পোশাক পরা জনতা শোভাযাত্রা করে বের হয়েছে তাদের দাবি জানাতে।

লক্ষ্মী বৌএর দোতালার বারান্দা থেকে দুপুরের সদ্য ঘুম ভাঙা বিরক্তি নিয়ে নটবর মুখুয্যে নীচের দিকে চেয়ে থাকে—আগে আগে চলেছে সেই অনুকূল—ওদের সকলের চীৎকারে নীরব কালীপুর মুখর হয়ে উঠেছে।

নটবরের ঘুম ভেঙ্গে গেছে ওদের চীৎকারে।

গাছের মাথায় বিশ্রামরত পাখীগুলো সশব্দে আকাশে উড়ে যায়। কালীপুরের আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছে কোন অজানা ঝড়ের সংকেতে।

তারই আকাশে উড়ে বেড়ায় নীড়ের সন্ধানে পথহারা একটি পাখী —ক্লান্ত তার ডানা। বাসা হারিয়ে বাসার ঠিকানা খোঁজে সন্ধ্যার আকাশে।

শীলা এখানে এসে যেন হারিয়ে গেছে। এককালে ছিল আদিম অরণ্য; আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাড়ি—সামনের ফাঁকা মাঠে দু'একটা শালগাছের শেষ বংশধররা কোনরকমে একটা দুটো কচি ডালের বুকে কয়েকটি ঝকঝকে পাতার সম্বল নিয়ে বেঁচে আছে। ওরা যেন শীলারই স্বগোত্রীয়, সব হারিয়ে স্বপ্ন আর দুর্বার আশা নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে চলেছে কঠিন রুক্ষ এই মৃত্তিকার বুকে।

, একক সেই স্বপ্ন দেখা তবু আশা ছাড়েনি তারা। বাঁচবার আশা। শীলাও তাই এমনি অবসর সময়ে দূর দিগন্তের শাল-বনসীমার দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখে।

মেয়ে কর্মচারীদের ছোট মেসটা তারা নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে।

পরিশ্রমের পর অপিস থেকে ফিরে আসে কোম্পানির গাড়িতে—তারপরই একা। আশপাশের বাংলোয় আলো জ্বলে—ভেসে আসে কলকাতা থেকে রেডিওতে গানের টুকরো সুর। কমলা ওকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে বলে ওঠে—চুপচাপ থাকো কেন বলদিকি?

ছোট্ট জবাব দেয় শীলা—এমনিই। বড় ক্লান্তি আসে।

কয়েকজন লেডি ক্লার্ক মিলে মেসের মত করেছে। সকলেই এসেছে অমনি দূর থেকে—ঘরবাড়ির স্পর্শ ছেড়ে। কমলা ওর খাটে বসে চেয়ে থাকে ওর দিকে কি যেন সন্ধানী দৃষ্টিতে। বলে ওঠে—

—প্রথম প্রথম কষ্ট হয় তারপর সবই সয়ে যায়। তাছাড়া এই পাণ্ডববর্জিত বুনো দেশে চাকরি কার ভালো লাগে বলো? নেহাৎ চাপে পড়েই এসেছি।

শীলা কথা বলে না। দূরে মেইন লাইন দিয়ে একখানা এক্সপ্রেস ছুটে গেল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। কলকাতা থেকে আসছে—মা, বাবার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে আর একজনের কথা—যার কাছ থেকে এড়িয়ে থাকার জন্যই এই বনবাস মেনে নিয়েছে।

তবু ভোলা যায় না তাকে—স্মৃতির করুণ একটি মুহূর্তের মত নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে মিশে আছে তার সান্নিধ্য। হয়তো তাই সে কালীপুরের মাটিতেই এসেছে আশ্রয়ের আশায়।

আজ মনে হয় ভাল সে বেসেছিল প্রদীপকে নিবিড় ভাবেই—কাছে থেকে তার গভীরতা অনুভব করেনি, আজ দূরে এসে পিছনের

দিকে চেয়ে দেখে অতীতের দিনগুলো ধরা দেয় শ্যাম সজীবতা নিয়ে —মধুর বিগত সে অধ্যায়।

—চল খেয়ে নিইগে। আবার সকালেই উঠতে হবে।

কমলার ডাক অন্যমনে উঠে বসল শীলা। দ্রুতগতিতে চলেছে এখানের জীবন—মেসিনের ক্রমঘূর্ণায়মান চাকার তালে। থামবার অবকাশ নেই—অবকাশ নেই আশপাশের সবুজ বনসীমার দিকে রাতের অধরা তারার হিসাব নিতে।

কাল সকালেই আবার সেই অপিসের প্রস্তুতি। স্নান করে সকালের ব্রেকফাস্ট খেয়ে রাস্তার মোড়ে ভিড়ে দাঁড়ানো—কখন আসবে স্টীল বাস—হুড়মুড়িয়ে চেপে ছুটতে হবে তিন মাইল পথ—তবে কারখানার অফিস।

ব্যস্ততা দিয়ে ভর্তি প্রতিটি মুহূর্ত—বাতাস ছেয়ে গেছে ব্লাস্ট ফারনেসের টারবাইনের গর্জনে। মনের সমস্ত সূক্ষ্ম চিন্তাধারার উপর একটা অসাড়তা আনে একটানা ওই গর্জনধ্বনি।

বাইরের সবুজ বনসীমার দিকে চাইবার, পাখীর ডাক শোনবার অবকাশ নেই।

হঠাৎ কোথায় যেন সুর থেমে যায় ওর মনে। অপিসে একমনে টাইপ করে চলেছে সেদিন জানলার বাইরে দেখা যায় সুদূর বনসীমার গায়ে গাঢ়হলুদের আভা, শীতের ছোঁয়ালাগা বাতাসে পাতা ঝরছে শালবনে—মহুয়াগাছের পাতাগুলো আগেই ঝরে গেছে, ডালে এসেছে থলো থলো হলদে ফুলের কুঁড়ি—পলাশবনের সবুজ পাতা ঢেকে লাল স্তবকের প্লাবন ডেকেছে। মনটা কেমন আনমনা হয়ে যায়। ভুলে যায় অপিসের কাজ। শীলা হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

—আপনি এখানে?

হঠাৎ কার ডাকে চমক ভাঙে; অপ্রস্তুত হয়ে নেশালাগা ওই দিগন্তসীমা থেকে চোখ ফেরাল শীলা।

—ডাঃ মজুমদার আপনি।

তাদেরই পাড়ার বাসিন্দা, ভবানীপুরের পরিচিত একটি মুখ। মাঝে মাঝে দেখতো ওকে পাড়ায় যাতায়াত করতে। মুখচোরা লাজুক একটি ছেলে ওর জানলার কাছাকাছি এসে মাঝে মাঝে রঙীন পর্দার দিকে চেয়ে থাকতো—কেমন উদাস দূরের মানুষের মত সেই চাহনি।

আজ অতি কাছে এসেছে যৌবনের সেই প্রথম মানুষটি, অপরিচিত বন্ধুবিহীন এই বনভূমিতে আজ তাকে নতুন করে আবিষ্কার করে শীলা।

নীরেশ এগিয়ে আসে। পরনে দামী স্যুট, চালচলনে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিস্ফুট, কঠিন ঋজু সবল একটি মানুষ। কিছু বলবার আগে নিজেই ওর সামনের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে দামী সেণ্ট-মাখানো রুমাল বের করে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বলে—তাহলে আপনিও এসেছেন এখানে। আছেন কোথায়?

শীলাও ক'মাসের এই স্বাবলম্বী জীবনে নিজেকে অনেকখানি গড়ে তুলেছে। কলকাতার ভীরু সলজ্জ সেই ঘরকুনো মেয়েটি আজ বাইরে এসে অনেক বদলে গেছে।

—বি এরিয়ায়। একটা ওয়ম্যানস্ হোষ্টেলে।

—হাসপাতালের কাছেই তাহলে।

সায় দেয় শীলা। নীরেশ ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে পড়ে, কাঁটামাপা এখানের জীবনযাত্রা।

—সময় হয়ে গেছে। ফিরতে হবে। পরে দেখা করবো।

জুতোর শব্দটা শক্ত মেজেতে ছন্দ তুলে মিলিয়ে গেল। আবার জেগে ওঠে অপিসের কর্মব্যস্ত পরিবেশ। শীলা যেন ঘটনাটাকে কেমন তখুনই ভুলে যেতে চায়। তবু পারে না।

অভ্যাসবশেই শীলা ঘাড় নাড়ে চুপ করে, নীরেশ বের হয়ে গেছে। জানলার বাইরে কঠিন মাটিকে চষে-ফেড়ে জল সেচ

করে ফুলের বাগান লাগিয়েছে। চোখ মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে শীলা।

শীতের শেষ—তখনও ডালিয়া বোগেনভিলার বেড়ে ফুলের রং যায়নি। নীরেশ পাশেই খোয়াঢালা রাস্তায় পার্ককরা গাড়িতে উঠে বের হয়ে গেল নিজেই ড্রাইভ করে।

শীলা আবার কাজে মন দেবার চেষ্টা করে; কেমন যেন মন লাগে না, অকারণে উদাস শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে পলাশের রং লাগা বনসীমার দিকে; ঘূর্ণিঝড়ে কাঁপছে মরা পাতা লাল ধূলো।

—ও কে? ওই ভদ্রলোক!

কমলা পাশের সিট থেকে ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। শীলার গালে আজ লজ্জার মধুর আভা জাগে। জবাব দেয়—আমাদের পাড়ার লোক. আগেকার চেনা। এখানের হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে এসেছেন।

কমলার দৃষ্টি এড়ায় না শীলার মুখের ওই মধুর সলজ্জ আভাটুকু; কণ্ঠস্বর কেমন যেন কাঁপছে।

পরক্ষণেই কঠিন হয়ে ওঠে শীলা। নিজের উপর নিজেরই লজ্জা আসে। ভাব-কাঙ্গাল মনকে চেনেনি সে। পাশাপাশি জেগে ওঠে প্রদীপের হাসিভরা মুখ—সতেজ বলিষ্ঠ সেই দেহ। সবকিছু এত শীঘ্র ভুলে যেতে পারে এ যেন নিজেই ভাবতে পারেনি শীলা। আবার কাজে মন দেয় জোর করে ওসব কোন ভাবনাই ভাবতে চায়না সে।

পরীক্ষা শেষ হয়ে আসছে। এতদিন একদিন একটা কাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিল, সব ভুলে আনন্দ পেয়েছিল প্রদীপ। কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল,—আজ কাজ শেষ হয়ে আসছে। এক একটা পরীক্ষা চুকছে আর সেই ভাবনাই বাড়ছে যেন। ভালোই দিয়েছে পরীক্ষা। অনার্স পেপারগুলোতে ভরসা করতে পারে তার সুনাম বজায় থাকবে।

বসন্ত সেদিন জিজ্ঞাসা করে—পাস করে কি করবি?

তা ঠিক করেনি প্রদীপ। চারদিকের ঝড় থেকে আত্মগোপন করার পথ হিসাবেই সে পড়াটাকে নিয়েছে—সবকিছু ভুলতে চেয়েছে ; তারপর কি করবে জানে না সে। জবাব দেয়—দেখি।

কিছু করবার কথা ভাবেনি এখনো, ভাবতে চায়নি। কেমন যেন নিজেকে ভোলবার জন্যই পড়ার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

বসন্ত বলে ওঠে—অনার্স পাবি ফিজিক্সে নিশ্চয়ই, ফার্স্ট ক্লাস অনার্স। কালীপুর টেকনিক্যাল কলেজে চলে যা, বাড়ির কাছেই একটা চান্স নিশ্চয়ই পাবি।

বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও তৈরী হচ্ছে। প্রদীপ কি ভাবছে। এর মাঝে যেন ভিড় ঠেলে হ্যাঁ একটি সুন্দর মুখও হাজির হয় মাঝে মাঝে। অন্যমনে জবাব দেয় প্রদীপ—

—যা হয় একটা কিছু করতে হবে। আগেকার মত জমিদারির আয় তো নেই, খেটে খেতে হবে এইবার।

কেমার কোম্পানিই একা বিপদে পড়েনি, কালীপুরের আশপাশে গজিয়ে উঠেছে ছোটবড় কয়েকটা প্রতিষ্ঠান। ওদিকে বন্দীপুরের পাশেই নতুন চিনাখাদের গায়ে অন্য একটি কারখানা, সিমেন্ট রড জমিয়ে পাইপ তৈরীর কারখানা, পাইপস্ কলোনী, আরও ছোটবড় প্রতিষ্ঠান। সকলেই এমনি করে কম-মাইনেতে দাবিয়ে রেখেছিল শ্রমিকদের। তারাও কেমার কোম্পানির এই আন্দোলনের দিকে চেয়ে আছে। সুযোগ পেলেই দলবদ্ধভাবে আঘাত হানবে। ক্রমশঃ কালীপুরের আকাশে ঘন মেঘ জমেছে। কালো ঝড়ো মেঘ।

সদ্যতৈরী লোহাকারখানার শ্রমিক সংঘও কেমার কোম্পানির মজদুর ইউনিয়নকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। চারিদিকে তারই প্রস্তুতি চলেছে।

নটবর মুখুয্যের বিশ্রামের অবকাশ নেই। বিক্রমনারায়ণ নবনী

মিত্রকে নিয়ে নানা দরবারে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। দরকার হয় ওদের মিটিং বানচাল করে দেবে—নাহয় ছুতোনাতায় লাঠি চালাতে হবে এই মতলবে। কোন দিকেই কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না বিক্রমনারায়ণ।

সেদিন কারখানার মাঠে জমায়েত হয়েছে মজুররা—ইতিমধ্যে টিনের বড় চোঙ্গাও তৈরি হয়ে গেছে; তাতেই মুখ দিয়ে বিকট স্বরে চীৎকার করছে। বিক্রমনারায়ণ আর নটবরকে গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে যেতে দেখে ওরা থামল না একটু, সমীহও করল না। বরং চীৎকারের মাত্রা বাড়িয়ে চলে আরও। কোন সমীহ না করেই।

—ও কে নটবর?

একটা ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে লোকটা। ওকেই নির্দেশ করে প্রশ্ন করে বিক্রমনারায়ণ।

—অনা ডোম বড়বাবু! নটবর জবাব দেয়।

—অনুকূল! বিস্মিত হয়েছে বিক্রমনারায়ণ। চমকে ওঠে হেসে। আজকের এই ঘটনাটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না বিক্রমনারায়ণ।

তাদের বাড়ির অন্নে প্রতিপালিত ওই লোকটা তাদের খেয়েছে পরেছে বহু বৎসর ধরে। একটা সম্পর্কও ছিল। কিন্তু সব যেন আমূল বদলে গেছে। আজ তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে অনা মাথা তুলে, একবার চেয়েও দেখল না তাকে। আজ রাতারাতি নেতা হয়ে গেছে! চুপ করে কি ভাবছে বিক্রম।

অনুকূল রাতের অন্ধকারে পথটা দিয়ে আসছে। বিজলীর আলো তাদের মহল্লায় আসেনি। লাইন পারে খেজুর ঝোপগুলো তেমনিই রয়েছে; পুকুরের পাড়ের নীচেই রাস্তায় গাড়িখানা থেকে কে যেন তাকে ডাকছে।

একবার দাঁড়াল। পরক্ষণেই যেন নিজেরই হাসি পায়, বনের বাঘ তাকে ডাক দিয়ে কাছে নিয়ে গিয়ে কিছু করতে পারেনি। আজ। নিজের উপর নিজেরই ঘৃণা আসে।

অনা এগিয়ে গেল তার দিকে। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িখানা। দরজা খুলে বের হয়ে আসে নটবর।

—এগিয়ে আয়, শোন।

ফিস্‌ফিসানি কণ্ঠস্বর। আবছা অন্ধকারে গাড়ির ভিতর বসে আছে বিক্রমনারায়ণ নিজে। নটবর বলে ওঠে—

—কিছু টাকাপয়সা নে, দিনকতক ছুটি দিই কোথাও ঘুরে আয়। কেন ওসব ঝামেলায় থাকবি?

প্রথমে কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না অনা। বুঝে বলে ওঠে—আজ্ঞে ওদের সব্বাইকে দিতে হবে তাহলে।

হাসে নটবর—একা তোকে দোব বলেই এসেছি। বড়হুজুর তোকে এতটুকু থেকে দেখছেন। তুই কাজকর্ম বুঝিস, ওদের সঙ্গে তোর সঙ্গ কেনে রে বাপু।

অনা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, পরিষ্কার হয় তার কাছে। কঠিনস্বরেই বলে ওঠে, অনা—

—তা হয় না বড়হুজুর। বেইমানি করতে পারবো না।

গাড়ি থেকে বের করে নটবর একটা সেলুফন কাগজে মোড়া পাঁইট বোতল। অনুমানে বুঝতে পারে অনেক দামী বিলেতী মদ। ওর দিকে এগিয়ে দেয় নটবর—

—নে, একটু ফুর্তি-আর্তি করগে। কাল সকালে বড়হুজুরের কুঠিতে দেখা করবি। কেউ জানতে পারবে না এসব।

একটা ভাষা অনুকূলের কাছে পরিষ্কার হয়; রক্তখেকো বাঘকে রাতের অন্ধকারে বনে ছাগল বেঁধে রেখে ডাক দেয় শিকারী। আশেপাশে বসে থাকে বন্দুক হাতে—সুবিধা পেলেই বাঘের সেই আসা শেষ আসা হয়।

তাকেও লোভ দেখাচ্ছে তারা। মদের বোতল হাত বাড়িয়ে নিল না অনা; জবাব দেয়—

—সবাইকে নিদেন চার আনা রোজ বাড়িয়ে ছ্যান, কুন গোলমাল হবেক নাই, সবাই কাজে লাগবেক।

বিক্রমের এই কথাগুলো অসহ্য ঠেকে, একজেদী লোকটাকে সহ্য করতে পারে না, এতকাল যারা ছিল পায়ের নীচে, যাদের কাছারি-বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে চাবুক কসেছে আজ কয়েক বৎসরের মধ্যেই তারা সামনে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করতে সাহস পায়।

নটবর দালাল ব্যক্তি, যেখানে ছুঁচ চলে না তুইয়ে-বাইয়ে সেখানে ফাল নামক বস্তুও চালাবার এলেম রাখে—তবে সময়-সাপেক্ষ। সে তখনও কি বলে চলেছে। হঠাৎ বড়-হুজুরের কথায় ফিরে চাইল। বিক্রমনারায়ণ সেই জমিদার-সুলভ কণ্ঠে হাঁক দেয়—

—উঠে এসো নটবর।

নটবর বুঝতে পারে হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। আপোষের পথও বন্ধ করে দিতে চায় বিক্রমনারায়ণ। মনে খুশীই হয়; গো-মড়কে শকুনির ভোজই লাগে—গোলমাল ঘটলে দালালের; চুপ চুপ করে গাড়িতে এসে উঠল নটবর। বিক্রমনারায়ণ গুম হয়ে বসে আছে।

একঝলক তেলপোড়া কালো ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িখানা চলে গেল, পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে অনা ডোম একা—কি যেন মস্ত একটা প্রলোভন সে জয় করেছে। নিজের উপর নিজেরই অনেকখানি শ্রদ্ধা আসে। অন্যদিকে বিক্রমনারায়ণের হীন স্বার্থপর মনটাকে দেখে শিউরে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট করবার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রমিকরা; শুধু কেমার কোম্পানিই নয়, পটারীর শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছে। তাদের

মাইনের একটা মোটামুটি রেট ঠিক করে—থাকবার কোয়ার্টারের দাবি জানিয়ে তারা মিটিং করে চলেছে।

বিক্রমনারায়ণের উপর চাপ আসে অন্যান্য মালিকদের; নবনী মিত্রের অপিসে একটা চেয়ারও খালি নেই। রাণীগঞ্জ থেকে এসেছে শেঠজী, অন্যান্য কারখানার মালিকরাও। সুবিনয় রায় বলে ওঠেন—যা হোক কিছু ওদের দিয়ে একটা মীমাংসা করে নিন বড়বাবু; আগুন একবার লাগলে ক্ষতি কিছু না কিছু হবেই।

মালিকরা দলবদ্ধভাবে সলাপরামর্শ করতে বাধ্য হয়েছে আগামী দিনের কথা ভেবে।

বিক্রমনারায়ণের মনে পড়ে কালকের রাত্রির কথা কথাগুলো; ওদের কাছে মাথা নীচু করে আপোষ মীমাংসা করতে যাবে না তারা; জবাব দেয় বিক্রমনারায়ণ—তারা রাজী নয় কোন মীমাংসায় আসতে।

নবনী মিত্র চুপ করে বসে থাকে। সুবিনয়বাবু নতুন কারখানা খুলেছেন। হাতে প্রচুর অর্ডার। এ সময় দাঁড়িয়ে লোকসান দিতে নারাজ।

সুবিনয়বাবু জবাব দেন—তাদের দাবি মানলেই তারা কাজে আসবে। অন্ততঃ কিছুটাও মানতে হবে।

কাল রাত্রে অনা ডোমের কঠিন কথাগুলো মনে পড়ে বড়বাবুর। অনা ডোমকে সমীহ করে ভয়ে আপোষ করতে হবে।

বিক্রমনারায়ণ কোনমতেই অনা ডোমের সঙ্গে আপোষের কথা বলতে রাজী নয়।

শেঠজী বলে ওঠে—কোশিষ কিজিয়ে। স্ট্রাইক মৎ হোনে দিজিয়ে। হোবে ত জরুর ভাঙ্গতে হবে। যো সো করকে।

গলা খাটো করে শেঠ ভালোটিয়া কি যেন গোপন নির্দেশ দেয়; কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে বিক্রমনারায়ণ। মুগ্ধবিস্ময়ে শেঠজীর দিকে চেয়ে থাকে—সাফ মাথা। এতটুকু খিঁচ কোথাও নেই।

মনে মনে তারিফ না করে পারে না বিক্রমনারায়ণ। প্রকাশ্যে বলে ওঠে—মীমাংসার শেষ চেষ্টা করবো আর একবার।

সুবিনয়বাবু যেন আশ্বস্ত হন, বলেন,—তাই করুন। দিনকাল বদলেছে, ওদের দাবি কিছুটা মানতেই হবে।

শেঠজী বাঙালীর এই উদারনৈতিক ব্যবসায়ী নীতিকে মানতে পারে না মোটেই, তবু হাসিমুখে সায় দেয়—

—জরুর। সো তো হোবেই করেগা।

চা সন্দেশ পানের সঙ্গে সেদিন মালিকদের মিটিং শেষ হল। একে একে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল তারা। আপিসঘরে এসে দেখে বিক্রমনারায়ণ—নটবর মুখুয্যে যথারীতি চেয়ার আগলে অপেক্ষা করছে। বিক্রমকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। নটবর আজ করবার মত একটা কাজ পেয়ে খুশী হয়েছে।

—একটা চাল চেলেছি বড়বাবু।

নটবর সেই খবরই দিতে এসেছে।

—কি? চিন্তিতমনে প্রশ্ন করে বিক্রমনারায়ণ।

নায়ক-বৌ আজ কালীপুরের মধ্যে অনেকখানি জায়গার মালিক। সেখানে এক কামরা ছাপরার ঘর তুলে কয়েক শো কুলিকে ভাড়া দিয়ে বেশ মোটা টাকা রোজকার করে লক্ষ্মী। নটবর সেইখানে গিয়ে জুলুম সুরু করেছে। বলে ওঠে নটবর—

—লক্ষ্মী বৌ-এর বাড়ির কুলি-ব্যারাক থেকে প্রায় দেড়শো লোককে তাড়িয়েছি। দেখুনগে না রাস্তায় বঁচকিবোঁচকা নিয়ে কাচ্ছাবাচ্ছা সমেত বসে আছে গঙ্গাসাগরের যাত্রীর মত। যা করগে ব্যাটারা ধর্মঘট।

—কেন? বিক্রম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। নটবর বিশ্বাসী কুকুরের মত ল্যাজ নাড়ছে।

—দু-হপ্তার ভাড়া বাকী, দিলাম সিনেমা হাউস আর চিনকুঠীর গুণ্ডাদের লেলিয়ে। হুদ্দাড় মালপত্র টেনে ছিটিয়ে ফেললে রাস্তায়।

বাবাধনরা সুড় সুড় করে পথে বসল এসে। আমিও পটাপট দিলাম বিবাক তালাবন্ধ করে।

নটবরের এই কাজে লক্ষ্মী-বৌ বাধা দেয় নি। মনে হয় দু-জনের মধ্যে নিবিড় যেন একটা সম্পর্ক আছে। অতীতে প্রতাপনারায়ণের সেই বন্দুক নিয়ে নটবরকে তাড়া করার কথাও ভুলে গেছে তারা।

খুব যেন বড় একটা কাজ করে এসেছে নটবর। বিক্রমনারায়ণ ওর দিকে চেয়ে থাকে। জানে না নটবর—রাস্তায় বের করে ওদের জব্দ করা যাবে না তাতে রাগ আরও বাড়বে মাত্র। পাগলা কুকুর চোট খেলে মরিয়া হয়ে আক্রমণ করে—এতে ওরাও তাই করতে পারে। বড়বাবু বলে ফেলে ভেবে-চিন্তে—

—কাজটা ঠিক ভালো করোনি নটবর।

বেলুন চুপসে যায়। নবাবের মাইনে করা তোসামোদের মতই নটবর মিয়োন গলায় বলে ওঠে—ঠিকই বলেছেন।

—সত্যিই ভুল করে ফেলেছি বড়বাবু।

বড়বাবু অন্য কথা ভাবছে—শেঠজীর সেই কথাটা। শেষ অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করবে তাকে। নটবরকে দিয়ে এই টাল-মাটাল অবস্থা সামলানো যাবে না।

শীলার মনে বসন্তের ছোঁয়া।

ভোরের আলো এসে পড়েছে গ্রিললাগানো জানলা দিয়ে পর্দাটা খোলা। বাইরের শালবন আর লাল কাঁকুরে ডাঙায় দিনের আলো মায়াজাল বিছিয়েছে। কোথায় বনে বনে ডাকছে পাখী। শাল-গাছের পাতায় বাতাসের একটানা শব্দ—ছুটির দিন, আজ আর সকালে উঠেই অপিসে যাবার তাড়া নেই। আগে সাগ্রহে সপ্তাহের এই দিনটির দিকে চেয়ে থাকতো। শনিবার অপিস করে স্টেশনে হাজির হতো, সন্ধ্যায় পৌঁছতো কলকাতায়, মা প্রতীক্ষা করতো দরজায়।

রবিবার বৈকালে আবার ফিরে আসতো। কিছুদিন থেকে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। বন্ধু কমলাই সেদিন বলে—

—কই রে ক-সপ্তাহ বাড়ি যাসনি? ব্যাপার কি?

সলজ্জ হাসির আভায় ওর সুগৌর কপোল টকটকে হয়ে ওঠে। কি যেন লুকোবার চেষ্টা করে সে। জবাব দেয়—

—এমনিই, মা ক-দিন তীর্থে গেছে কিনা, গিয়ে কি করবো সেখানে।

কমলা বলে ওঠে—না নতুন বাড়ির সন্ধান পেয়েছিস এখানে? কোন্‌টা সত্যি?

—তুইও যেমন। তা আর বরাতে ঘটল কই?

শীলা কথাটা বলে হালকা স্বরে। চুপ করে ভাবছে কমলা। শীলার জন্য আজও অন্য জগতের আমন্ত্রণ আছে। কমলা জানে তার নিজের কথা। যেমন কালো রং তেমনি স্বাস্থ্য—জীবনের কঠিন সংগ্রাম তার দেহমনের সব শ্রীটুকুকে নিঃশেষে লুটে নিয়ে কাঙাল দেউলে করে দিয়েছে তাকে।

দরজায় হর্নের শব্দ শুনে চমকে ওঠে কমলা। তার জন্য কেউ আসে না। শীলাও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে। স্নান সারা হয়ে গেছে, একরাশ কোঁকড়ানো চুলে দু-এক বিন্দু জলকণা লেগে রয়েছে। পরনে হালকা কলাপাতা রঙের শাড়ি, দেহমন ঘিরে শ্যাম সজীবতা পরিস্ফুট। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে যাবার সময় কমলাকে বলে যায়—

—এবেলায় মিল নিতে 'না' করে দিস।

জবাবের অপেক্ষা না করেই ছন্দোবদ্ধ গতিতে হালকা পদক্ষেপে গিয়ে ডাঃ মজুমদারের পাশের সিটে বসে দরজা বন্ধ করে হাত নেড়ে বিদায় জানায় কমলাকে।

কমলা জানলা থেকে চেয়ে থাকে ওদের দু-জনের দিকে। নীরেশ গাড়ির দরজা বন্ধ করে প্রশ্ন করে শীলাকে—কোন্‌দিকে যাবে আজ?

নীরেশ ভিড় কাটিয়ে চলেছে জি. টি. রোডের দিকে। ছুটির দিন—রাস্তায় বের হয়েছে গাড়ির সারি। দেশী-বিদেশী সাহেব—ইন্‌জিনিয়ার—কলিয়ারী ম্যানেজারের দল সপরিবারে আউটিং-এ বের হয়েছে।

শীলা বলে ওঠে—যেদিকে দু-চোখ যায় চলো।

—তা হলে তো গাড়ি খানায় পড়বে। অবশ্য দু-জনে একত্রে সেখানে যেতেও রাজী আছি।

—ইস্। হাসে শীলা।

হাওয়ার বেগে মসৃণ রাস্তা দিয়ে চলেছে গাড়িখানা অবাধ আনন্দে অধীর হয়ে। দু-পাশের ঘন শালবনসীমায় হাওয়ার সুর ওঠে। কেমন যেন অসীমে হারিয়ে যেতে চায় সে।

ডানদিকে কোকওভেনের পাশ দিয়ে নদীর ব্যারেজের দিকে এগিয়ে চলে। শীলা যেন গাড়ির বেগে হাওয়ায় উড়ে চলেছে। গুণগুণিয়ে গানের সুর আছে। আজ জীবনের পরম পাওয়া যেন তার হাতের মুঠোয়, এতদিন ধরে কিসব ছেলেমানুষি করে এসেছে। ভাবলেও হাসি পায় শীলার।

বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি একদিকে অন্যদিকে লক্‌গেটের বাঁধনে বদ্ধ অসীম জলরাশি। দামোদরের গেরুয়া জল থিতিয়ে কাজলকালো হয়ে উঠেছে। বিস্তীর্ণ জলরাশির বুকে জাগে বাতাসের বেগে উত্তাল ঢেউ, পাথরের দেওয়ালে আছড়ে পড়ে সশব্দে। ব্যারেজের পাশে গাড়িখানা রেখে দু-জনে নেমে পড়ল। চারিদিকে অবাধমুক্ত পৃথিবী আর নীল দিক চক্ররেখা।

হালকাপায়ে ফুলের কেয়ারি করা বাগানের মধ্য দিয়ে নীচের ওই বালিয়াড়ির দিকে ছুটে চলে শীলা। বাধা মানে না এই আনন্দ। নীরেশের মনে কি যেন কামনার সুর। বিরাট অসীমে—বালির বুকে মরা মানাবনের ধারে ঘুরে বেড়ায় তারা দু-জনে, কোথায় হারিয়ে যেতে চায়।

জলের আবছা রেখা ভির ভির করে বয়ে চলেছে। তারই পাশে বসে পড়ে শীলা।

—আর পারি না ইস্, কতখানি এসে গেছি।

দূরে পাহাড়ের মত উঁচু বাঁধটা দেখা যায়; ফুলের বাগানটা দেখে মনে হয় যেন রংবেরং-এর গালচে পাতা। টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার বের করে—শীলা নিজেই দু-হাতে ভিজে বালি খুঁড়তে থাকে, অল্প খোঁড়া হতেই কাঁচধার জল চুঁইয়ে পড়ে।

ভিজে বালিগুলো নিয়ে আপনমনেই ঘর বানাতে থাকে ছোট্ট মেয়ের মত। বাল্যের স্বপ্ন দেখে।

—ওকি হচ্ছে?

নীরেশ ওর ঘরখানা দেখে হেসে ফেলে।

—ঘর গড়ছি। বিজ্ঞের মত জবাব দেয় শীলা।

—শেষকালে ঘর গড়লে দামোদরের চোরাবালিতেই, একদমকায় কোন্ দিকে হারিয়ে যাবে যে!

নীরেশের কথায় চমকে ওঠে শীলা।—বেদনাহত দুটি চোখের আয়ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে নীরেশের দিকে। অবাক হয়ে যায় নীরেশ, বলে—কি হল তোমার?

মুখ নামাল শীলা। কি যেন নিষ্ঠুর একটা স্বপ্ন তার সামনে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। তার ঘরবাঁধার আশা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয়েছে। একজনের কথা মনে পড়ে—প্রদীপ। আজ সে হারিয়ে যাওয়া একটি সত্তা। নীরেশের দিকে চেয়ে মুখ নামাল।

বুক চিরে আসে দীর্ঘশ্বাস শীলার। অজ্ঞাতেই সবচেয়ে দুর্বলতম জায়গাতেই চিরন্তন নারী যেন কঠিন আঘাত পেয়েছে। অতীতের একটি স্বপ্ন যেন মরিচীকায় পরিণত হয়েছে।

—খাও! নীরেশ অনুরোধ করছে তাকে।

খাবারগুলো তুলে নেয় শীলা। ঘর তৈরীর আগ্রহ তার থেমে

গেছে।. চুঁয়োনো জলের আঘাতে গলে পড়ছে ভিজে বালির প্রাসাদ তিল তিল করে। তার চোখের সামনে।

সোঁ সোঁ ছন্দ জাগে বালির বুকে বাতাসের আনাগোনায়। কাঁপছে মানাবন। কোথায় ডাকছে একটা পাখী। ছু-জনে উঠে এল নদীর বালি থেকে বাঁধের উপর। আকাশে সোনা রোদ অভ্র রং ধরছে। চিকচিক করছে সোনারোদ।

এখানে বাতাসটা আর্দ্র জলকণাসিক্ত। জলের বুক থেকে বাতাস যেন সদ্যঃস্নান সেরে শুচি হয়ে আসছে।

গাড়িখানা কালীপুর বাজার হয়ে আসছে—কয়েকটা টুকিটাকি কেনবার ছিল শীলার। তাদের কলোনীর বাজারে সব সময় সব জিনিসপত্র মেলে না, মিললেও দাম পড়ে দ্বিগুণ। তাই ফেরবার পথে কেনাকাটা সেরে যেতে চায় তারা।

নীরেশ সায় দেয়—চলো একটু ঘুরেই যাই।

ছুটির দিনটা সম্পুর্ণভাবে উপভোগ করতে চায় সে। পুরো দিনটাই। তাই এমনি অকারণে যাতায়াত।

হঠাৎ গাড়ি বাজারে ঢোকবার মুখে আটকে গেছে। আগে পিছনে রয়েছে সরু রাস্তায় ক-খানা গাড়ি, ট্যাক্সি, মালবোঝাই বড় ট্রাক ; বের হবার উপায় নেই। নীরেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে, গাড়ির স্পীড বন্ধ করে বলে—

—বেশ আটকে গেলাম শীলা।

হাসে শীলা—তাই দেখছি। কি ব্যাপার ?

গাড়ি থেকে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেমার কোম্পানি এবং আরও ছু-একটা কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক শোভাযাত্রা বের করে চলেছে। সঙ্গে আছে লক্ষ্মী-বৌ-এর ব্যারাক থেকে তাড়া খাওয়া সেই মেয়েছেলের দল। শীর্ণ মলিন বুভুক্ষু জনতা। পরনে অনেকের লজ্জা নিবারণ করবার জন্য সামান্য একফালি ন্যাকড়া-গোছের আবরণ। তারা চীৎকার করে চলেছে।

শীলার দু-চোখে ঘৃণাভরা চাহনি বলে ওঠে—

—জানোয়ারের দল চলেছে নাকি।

—লেবার। ডাঃ মজুমদার শুধরে দেয়।

শীলা ঠোঁট উলটে জবাব দেয়—ছাই। দেখছো না বন থেকে সত্ত বের হয়ে আসা জানোয়ারের দল চলেছে।

দু-পাশে জমেছে দর্শকরা ; স্টেশনে এসে থেমেছে কলকাতা থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনখানা। তার যাত্রীরাও নামতে পারেনি। প্ল্যাটফরম ওভারব্রিজের উপর থেকে ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। বাস, মালবোঝাই ট্রাক, স্টীল কোম্পানীর বাস, সাইকেল রিক্সা সারবন্দী দাঁড়িয়ে গেছে। চারিদিকে কৌতূহলী জনতা কালীপুরের প্রথম শোভযাত্রার দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ পিছনে ওভারব্রিজের উপর দৃষ্টি যেতে চমকে ওঠে শীলা। হাজার জনতার মাঝে মনে হয় নিঃসঙ্গ একক সে। কে যেন তার দিকে স্থির ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শীলার মনে আচমকা ঝড় ওঠে।

প্রদীপ।

হ্যাঁ তেমনি বলিষ্ঠ ফরসা দেহ, চোখের চাহনিতে একটা নিবিড় আকুতি। সমস্ত মনের কঠিন ঋজুতা ভেদ করে একটা নীরব বেদনার ছায়া তাতে পরিস্ফুট। শীলার দৃষ্টি এড়ায় না।

প্রদীপই তাকে দেখতে পেয়েছে। দেখেছে তার লাস্যময়ী রূপ। নামবে কিনা ভাবছে শীলা।

হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট নেয়, সামনের ভিড় সরে গেছে। চলতে শুরু করে আবার গাড়ির সারি। হর্নের শব্দ, ড্রাইভারদের হিন্দী পাঞ্জাবী মেশানো গালাগালির সুর ওঠে, গাড়িখানা চলে গেল সামনের দিকে।

ওভারব্রিজের উপর দাঁড়ানো প্রদীপকে আর দেখা যায় না। থরথর করে কাঁপছে শীলা। কি যেন নিবিড় উত্তেজনায়।

নীরেশ গাড়ি সামলাতে ব্যস্ত। শীলার দেহমনের উপর নীরব এই ঝড়টার কথা বিন্দুমাত্র টের পায় না।

বড় দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই নেমে পড়ে নীরেশ।

—চল।

শীলা সহজ হয়ে পড়ে, স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দেয়—

—হ্যাঁ।

দু-জনে দোকানে ঢুকল। কালীপুরের রূপ বদলে গেছে। আজ গড়ে উঠেছে সেখানে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। কাঁচের শো-কেসে সাজান থাকে রকমারি পোশাক, অন্যান্য জিনিসপত্র। অ্যাডিং মেসিন নিয়ে ক্যাসে বসে আছে ক্যাস ক্লার্ক। ব্যস্ত দোকানের ভিড়ে হারিয়ে যায় তারা।

প্রদীপ মায়ের চিঠি পেয়ে পরীক্ষা শেষ করেই ফিরছে হঠাৎ। ইচ্ছে ছিল পরীক্ষার পরিশ্রমের পর কিছুদিন কোথাও চেঞ্জে যাবে। পুরীতে যাবার ব্যবস্থাও করেছিল সব, কিন্তু হঠাৎ মায়ের চিঠিখানা পেয়ে চলে আসছে। কি যেন সব গণ্ডগোল চারদিকে। বাবাও চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অসুস্থ শরীর—কেমন যেন ওই কঠিন দেহের ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরেছে। এই সময় সীতা একলা ভরসা পায় না। তাই প্রদীপকে কাছে রাখতে চায়। চারিদিকের এই পরিবর্তনের মাঝে সীতা আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করে, প্রতাপনারায়ণও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আসছে প্রদীপ। সারা মনে অপরিসীম শূন্যতা বাবার জন্য এতদিন কোন চিন্তাই করেনি, আজ নতুন করে চিন্তা করে।

কালীপুরে নেমে ওভারব্রিজ পার হয়ে আসছে বাইরের দিকে, হঠাৎ কানে আসে আকাশ-বাতাসে হাজারো কণ্ঠের গর্জনধ্বনি।

সুপ্ত কালীপুরের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে উঠছে ওই গর্জনধ্বনি। শোভাযাত্রা চলেছে—আগে আগে চলেছে অনা ডোম, ভোলা মাঝি।

রাতের অন্ধকারে যারা বন্দুক-হাতে আদিম অরণ্যে ঘুরতো বন্তপশুর সন্ধানে, আজ প্রকাশ্য দিবালোকে তারা বের হয়েছে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে আজকের মানুষের অন্যায়ের।

প্রদীপের রক্তে কেমন জোয়ার আসে, বাঁধভাঙা জোয়ার। ওদের গর্জনে কাঁপছে আকাশ-বাতাস। মনের পরতে পরতে জাগে প্রদীপের নতুন কোন সত্তা।

হঠাৎ চোখ পড়ে কালো গাড়িখানার দিকে। চমকে ওঠে। অতিপরিচিত মুখখানা আজও মনে পড়ে তার। তাকে ভোলা যায় না। এক নজরেই চিনতে পারে।

শীলার দেহে এসেছে পূর্ণতার জোয়ার। হঠাৎ প্রদীপের দিকে চোখ পড়ে তার। একটি মুহূর্ত।

ভুলে যায় প্রদীপ কালীপুরকে—ওই জনতার শোভাযাত্রা, জেগে থাকে শাশ্বত ছুটি ব্যাকুল মন।

—শীলা!

অজ্ঞাতেই ডেকে ওঠে। ভিড়ে কোলাহলে সেই ডাক তার চাপা পড়ে যায়, শোনা যায় না।

গাড়িখানা আবার চলতে থাকে ভিড় ঠেলে। ওভারব্রিজ থেকে নেমে আসবার পর আর দেখা যায় না এগিয়ে গিয়ে থামল সে।

সাইকেল রিক্শাওয়ালারা হাত ধরে টানাহেঁচড়া সুরু করেছে। আইয়ে বাবু।

নেলাচিতি—বন্দীপুর—হাতীশালা; চলে আসুন বাবু।

—আইয়ে সাব।

সামনের রিক্শাটাতে উঠে বসে প্রদীপ।

—বাবু! ছোটবাবু বাড়ি ফিরলেন?

তাদেরই গ্রামের গোপাল, চাষার ছেলে। হাল-বলদ ছেড়ে সাইকেল রিক্শা চালাচ্ছে। সুটকেশ বেডিংটা তুলে দিল কুলি।

গোপাল মাথার টুপিটা পরে নিয়ে সাইকেল রিক্সার সিটে বসে তৈরী হয়।

—আমাদের বাড়ির সব ভালো রে।

ছেলেটা জবাব দেয়—গাঁয়ে যাইনি দু-দিন বাবু, কালীপুরেই রইছি। এদিকে তুলক্রম বেধে গেছে যি।

—কেন রে?

—দেখলেন না। ধর্মঘট হবে বিবাক কারখানায়, তারই তোড়জোড় লেগেছে। ক্ষেপ মারতে পারলেই পয়সা। চলেন চলেন জলদি আপনাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবো।

ছেলেটা প্যাডেল করতে থাকে জোরে। কালীপুর ছাড়িয়ে চলেছে রিক্‌শা নড়বড় করে।

প্রদীপ ভিড়ে আর শীলাকে খুঁজে পায় না। একনজর দেখেই হারিয়ে ফেলে আবার। দূরে চলেছে গাড়িখানা।

—কার গাড়ি? ওই যে ওটা?

—আজ্ঞে কারখানার ডাক্তারবাবুর গাড়ি।

প্রদীপ কথা বলে না। কর্মব্যস্ত রাস্তা থেকে সুপ্ত গ্রামখানায় ঢুকলো। গাছগাছালির মাথায় তাদের কালো শেওলাপড়া বাড়িখানা দেখা যায়; ছাদের উপর অশথগাছটা বেশ জেঁকে বসেছে, ফেটে গেছে চিলেছাদটা। এই বর্ষার জলেই ধ্বসে পড়বে মনে হয়।

ব্যস্ত হয়ে দিকে চলে গেল প্রদীপ সুটকেশ হাতে। ছেলেটা বেডিং মাথায় করে এগিয়ে দেয়।

বিক্রমনারায়ণ শেষ অস্ত্রই ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে, কোন পথ না পেয়ে। এই ক-দিন জননেতা নটবর বিক্রমনারায়ণের সঙ্গে এঁঠুলির মত লেগে আছে। বিক্রমকে বের হতে দেখে সে এগিয়ে আসে।

—সঙ্গে যাবো?

বিক্রমনারায়ণ চিন্তিতমুখে জবাব দেয়—না। একলাই যাবো।

নটবরকে বলে না বিক্রম তার গন্তব্যস্থল।

বিক্রমনারায়ণ এড়িয়ে গেল নটবরকে। সব জায়গায় ওর নাক গলানোটা পছন্দ করে না বিক্রম। একাই এগিয়ে যায়।

প্রদীপনারায়ণ বহুদিন পর বিক্রমনারায়ণকে এই পুরানো বাড়িতে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হয়। বিক্রমনারায়ণ ভাঙা দেউড়ির বাইরে গাড়ি রেখে মরা হাজা বাগানের মধ্য দিয়ে জনহীন প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসে। পথটা ঘাসে আগাছায় ঢেকে গেছে।

বুড়ো চাকর গুপী জানে ছোটবাবুর রোজ মাংস খাওয়ার অভ্যাস। আগে রোজই খাসি না হয় মুরগি আমদানি করা হোত। পাক্কা দু-সের মাংস খেতে পারতো প্রতাপনারায়ণ। এখন সেই মাংস সপ্তাহে দু-দিনে এসে ঠেকেছে। ডাক্তারের নিষেধ—খাওয়া কমাতে হবে। তাছাড়া ভিতরের অবস্থা জানে গুপী—তিন টাকা সের মাংসের ; তাই বাজার থেকে না কিনে এনে গুপী ওটা এখানেই সংগ্রহ করে মাঝে মাঝে। পুরোনো বিরাট বাড়ি আজ জনহীন। কাছারিবাড়ির কার্নিশে ছাদে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য কবুতর। সন্ধ্যার অন্ধকারে খোপে খোপে হাত পুরে দু-চারটেকে ধরে ফেলে পরদিনের খোরাকের জন্য।

এইভাবেই সংগৃহীত হয় প্রতাপনারায়ণের বরাদ্দ মাংসটুকু। প্রতাপ জানে তবু বলে না। কিন্তু মাংস ছেড়ে দেবে তাই ভাবছে। তবু অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি।

সেদিন গুপী কাছারিবাড়ির এককোণে এককোণে একটা মরা পেঁপে গাছের নীচে বসে পালকগুলো ছাড়াচ্ছে—হঠাৎ বড়হুজুরকে আসতে দেখে বামাল পাচার করতে না পেরে হাতেনাতেই ধরা পড়ে যায়। ইতস্ততঃ করে দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো গুপী।

দাঁতপড়া মাড়ি বের করে গড় হয়ে বলে চলে গুপী মিথ্যা কথাগুলো।

—ছেলেটার অসুখ, ডাক্তার বলে মাংসের ঝোল দিতে। পয়সা দিয়ে কোথেকে কিনি হুজুর। আপনাদের খেয়েই মানুষ তাই লিলম দুটো পায়রা।

বিক্রমনারায়ণ কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় ভিতর-বাড়ির দিকে। চারিদিকে চেয়ে দেখে বিক্রম। এবাড়ীর জীর্ণ অবস্থা।

এইখানেই মানুষ হয়েছে। আজ মৃত অতীতের মাঝে এসে ক্ষণিকের জন্যও যেন বদলে গেছে একালের এই মানুষটি। এদিক ওদিক চায় বিক্রমনারায়ণ।

—একবারে যে ভেঙে পড়বে রে বাড়ির ঠাঁই ঠাঁই!

গুপী মাথা নাড়ে—সবই তেনার ইচ্ছে। না হলে সাজানো বাগান শুকিয়ে যায় এমনি করে।

ভূতোপুরীতে থেকে আর অনেক কিছু দেখে গুপীও দার্শনিক হয়ে উঠেছে।

দাদাকে এবাড়িতে আসতে দেখে এগিয়ে আসে প্রতাপ অভ্যর্থনা করতে। সীতা দূর থেকে ভাসুরঠাকুরকে গড় হয়ে প্রণাম করে। বিক্রম চেয়ে রয়েছে প্রতাপের দিকে—ক-বছরেই ওর সেই কঠিন দেহে কোথায় যেন ভাঙনের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছে। মনে হয় এই পুরোনো ধ্বসেপড়া বাড়িটার মত এখনও দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে—কিন্তু হঠাৎ যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে ধূলিসাৎ হয়ে।

সে আজ এসেছে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে। তাই ওসব মায়াদয়া, অতীতের জন্য শোক বিন্দুমাত্র তার মনে নেই। নিজের বিপদে ছুটে গেছে প্রতাপের কাছে।

বিক্রমনারায়ণের ওসব ভাববার সময় নেই। বলে চলেছে কথাগুলো—কেমন করে আজ চৌধুরীবংশের শেষ সম্মানটুকু মাটিতে

লুটিয়ে দিতে চলেছে অনা ডোম—যে অনা তাদেরই অন্নে প্রতিপালিত। যে কালীপুর ছিল তাদের জমিদারি আজ সেই কালীপুরের মাটিতে চৌধুরীবংশের চরম অপমান ঘটতে চলেছে তাদেরই হাতে।

বিক্রমের মুখে চোখে পরাজয়ের তেমনি কালো ছায়া। আতঙ্কে যেন শিউরে উঠেছে আজ সে। তার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেবে অনা ডোম।

প্রতাপনারায়ণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে! অনুকূল ছিল তার প্রিয়তম পার্শ্বচর। তার সঙ্গে বাঘের মুখে এগিয়ে গেছে, সাপের দংশনও অগ্রাহ্য করেছে। সেই বন্য অনুকূলকে আজ ভয় করে বিক্রমনারায়ণ; সেই অনুকূল আজ চৌধুরীবংশের চরম অপমান করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এটা যেন বিশ্বাসই করতে পারে না প্রতাপনারায়ণ। বিক্রমের দিকে চেয়ে থাকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। কি ভাবছে প্রতাপ।

বিক্রমনারায়ণ বলে ওঠে—হ্যাঁ। দিন আজ এত বদলে গেছে। একা অনা নয়—পিছনে ওর হাজার লোক।

—হোক। তবু অনুকূলকে চেনে প্রতাপ।

বিক্রম প্রতাপের হাত দুটো ধরে অনুনয় করে—

—তুমি গেলে সে মাথা তুলতে পারবে না এ জানি। তাই তোমার কাছেই এসেছি। বংশের এই চরম অপমান তুমি থাকতে তোমার সামনে ঘটবে এটা ভাবতে পারি না। চিরকালই তুমি এগিয়ে গেছো; তুমিই অর্জন করেছিলে এত বড় এস্টেট।

বিক্রমনারায়ণ যেন আজকের এই অন্য মানুষ। সীতা বাইরের জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর চেয়ে দেখেছে দৃশ্যটা। বড়ঠাকুরের এই কথাগুলো কানে যায়। সীতা যেন অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে। আগে দেখেছে এমনি অনুরোধ আদেশের পরই রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যেতো সেদিনের দুর্মদ প্রতাপনারায়ণ রাইফেলহাতে ঘোড়ায়

চড়ে। চোখেমুখে কি একটা শ্বাপদ লালসা—বাধা দেবার চেষ্টা করেছে সীতা সেদিন সেই প্রাণঘাতী আক্রমণে যেতে কিন্তু পারেনি।

আজও যেন কি একটা তেমনি চক্রান্ত চলেছে। স্বার্থবুদ্ধিই বড় বিক্রমনারায়ণের কাছে। তাই নিয়েই এসেছে প্রতাপের কাছে।

প্রতাপের চোখেমুখে কি একটা কঠিন পরিবর্তন ফুটে উঠেছে—পায়চারি করছে প্রতাপ। বয়সের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—তবু ঋজু সোজা বিক্রমের চেয়ে। পায়চারী করছে ক্রমশঃ বদলাচ্ছে তার মুখচোখের চেহারা।

টকটকে রঙীন হয়ে ওঠে মুখচোক। কুঞ্চন করা যেন ঢাকা পড়ে গেছে, বলিষ্ঠ মানুষটি আবার মাথা তুলছে সব বাধা ভেদ করে। বিক্রমনারায়ণ প্রতাপের দিকে ব্যাকুল আশাভরে চেয়ে আবেদন জানায়—বেশী দেরি করলে কোন ফলই হবে না।

হু হু বাতাস বইছে, বুনো বাতাস।

তেমনি কোন অজানা সুর মনে মাতন তোলে প্রতাপের, হারানো দিনগুলো ফিরে আসে।

—বেশ, যাবো। প্রতাপনারায়ণ কথা দেয়।

সীতা জানলা থেকে সরে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। কি ভাবছে। ওকে ফেরানো যাবে না—সম্ভব নয়। প্রদীপের কথা মনে পড়ে। ওই একমাত্র ভরসা—প্রদীপকেই চিঠি লেখে সীতা। চিঠি পাবামাত্র চলে আসতে বলে। আজ সত্যিই ভয় পেয়েছে সীতা।

বিক্রমনারায়ণ খানিকটা হালকা মনে কালীপুরের দিকে আসছে। দু-এক দিনের মধ্যেই শ্রমিকসংঘের সাধারণ প্রকাশ্য মিটিং হবে। সেই আসরেই দেখা করবে প্রতাপনারায়ণ অনুকূল ভোলা মাঝির সঙ্গে। একটা বোঝাপড়া হবে।

মনে মনে হাসে বিক্রম। বংশমর্যাদার কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলতে পেরেছে। ওই একটিমাত্র কথা যা দিয়ে প্রতাপের মত কঠিন মানুষটিকে টলাতে পেরেছে।

কি তার দাম জানে না; নটবর মুখুয্যের বংশমর্যাদাটা কি জানে না। এ অঞ্চলের জননেতা।

হাসছে বিক্রমনারায়ণ; কোথায় কত পিছনে পড়ে আছে প্রতাপনারায়ণ ওই বন্দীপুরের শেওলাঢাকা ধ্বংসপুরীর অতলে।

প্রদীপ বাড়ি ঢুকেই মাকে দেখে আশ্বস্ত হয়।

—ব্যাপার কী, সাততাড়াতাড়ি চলে আসতে বললে।

সীতা ছেলের দিকে চেয়ে থাকে আশাভরে—আয় বাবা। একটু জিরো। পরে কথাবার্তা হবে।

তাকে উপরে নিয়ে গেল। মায়ের মনে কোথায় যেন একটা গুমোট ঝড় উঠেছে তা ওর থমথমে মুখচোখের দিকে চেয়েই অনুমান করে প্রদীপ। মাকে এত বিচলিত হতে এই প্রথম দেখল সে। অভাব কষ্ট কত কি তাকে টলাতে পারেনি—আজ সামনে নতুন কি এক কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

খেতে খেতে মার কথাগুলো একমনে শোনে প্রদীপ। প্রদীপের আসায় অর্থ আজ পরিষ্কার ধরা পড়ে। স্টেশনের বাইরে দেখেছে সেই উত্তাল জনস্রোত, প্রবল আবর্তের মুখে বাধা দেবার মত শক্তি কারো নেই। ওদের দাবি মানতেই হবে।

তা না মেনে এখনও বিক্রমনারায়ণের মত শয়তান লোক বড়ের চালে কিস্তি নেবার চেষ্টা করে। প্রদীপ প্রশ্ন করে,

—বাধা দাওনি কেন? কেন বলোনি বাবাকে জ্যাঠামশায়ের মতলব।

সীতা অসহায় কণ্ঠে জবাব দেয়—কোনদিন কোন বাধা উনি মানেননি। আজ?

—সেদিন আর আজকের দিনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত

হয়ে গেছে মা। সেদিন যেটা ছিল পৌরুষ আজ সেটা নীচতা—গোঁয়াতু´মি। একে প্রশয় দিতে পারা যায় না। এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।

প্রদীপর কথাগুলো বেশ জোরেই এবাড়িতে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

হঠাৎ দরজার সামনে প্রতাপনারায়ণকে দেখে থতমত খেয়ে গেল সীতা। প্রদীপ বাবার কঠিন কঠোর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার কথাগুলো সবই শুনেছে যেন। প্রতাপনারায়ণ ছেলের দিকে চেয়ে থাকে স্থিরদৃষ্টিতে—যেন বনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তীব্র স্থির দৃষ্টিতে কোন শিকারের দিকে চেয়ে আছে অতীতের সেই যুবক প্রতাপনারায়ণ। বলে ওঠে—এতখানি এগিয়ে যাবার যোগ্যতা আজও আসেনি প্রদীপ। সেই কথাটাই ওদের বলবো আমি।

শ্লেষের সঙ্গে জবাব দেয় প্রদীপ।

—কার পক্ষ নিয়ে? বিক্রমনারায়ণ, নবনী মিত্র, শেঠ ভালোটিয়ার হয়ে ওই কথা বলা যায় না।

—না। ওদের দলে আমি নই। যারা রাতারাতি সব ভেঙে তছনছ করতে চায় তাদেরই বলবো—এতটা বেগে নয়। আস্তে যেতে হবে। ওরা ভুল করছে সেই কথাটাই বলবো।

—না শুনলে?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে প্রতাপনারায়ণ—আর ভোলা মাঝিকে চিনি প্রদীপ।

—তারাই সব নয়, বৃহৎ জনস্রোতের একটি অংশমাত্র। ওদের দাবি কিছু মেনে নিয়ে ওরা আপোষ করুক। মালিক মজুর দ্বন্দ্ব, এতে আপনি নাই বা গেলেন।

প্রতাপনারায়ণ শুধু বলে স্থিরকণ্ঠে—ওদের কথা দিয়েছি। আমি বেঁচে থাকতে চৌধুরীবংশের অপমান হতে দোব না। বাধা দোবই।

প্রদীপ অবাক হয়ে মানুষটির দিকে চেয়ে থাকে। সীতার চোখে বেদনাভরা আর্তি। প্রতাপ চলে গেল। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে প্রদীপ। সবকিছুর জন্য আজ দায়ী ওই বিক্রমনারায়ণ। প্রতাপনারায়ণকে টেনে নামিয়েছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই জঘন্য পরিবেশে।

বিক্রমনারায়ণও বসে ছিল না। চারিদিকে তার সাবধানী দৃষ্টি।

প্রদীপ আসার খবরটা পেয়েই যেন বিক্রম ছুটে এসেছে। অনুমান করেছিল বৌমা ব্যাপারটাকে ভালচোখে দেখবে না; প্রদীপকে তাই আনিয়েছে। দু-জনের অনুরোধে যদি শেষ পর্যন্ত প্রতাপ বিগড়ে যায় তাই বৈকালে নিজেই গাড়ি নিয়ে এসেছে। সাত তাড়াতাড়ি।

প্রদীপ বাবার ঘরেই ছিল—প্রণাম করতেই বিক্রমনারায়ণ সাত-তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ফর্মখানা বের করে এগিয়ে দেয় প্রদীপের দিকে—সই করো, করে আমার হাতেই দাও। দেখি ব্যবস্থাটা করে ফেলতে পারবো আজিই।

—কিসের ফর্ম। প্রদীপ বিস্মিত হয়। প্রতাপও। জানলা থেকে সীতাও চেয়ে দেখছে।

বিক্রম বেশ গলা তুলেই বলে ওঠে।

—লোহাকারখানায় কিছু ইঞ্জিনিয়ার দরকার, বি.এসসি. অনার্স নিয়ে পাস করবেই, তোমাকে ওরা নিজেদের খরচায় বিলেত পাঠাবে। ব্যস, পাস করে এসে ওদের ওখানেই বিরাট চাকরি। গাড়ি বাংলো সবকিছু, মাইনেও ধরো বোনাস টোনাস নিয়ে প্রায় দেড় দু-হাজার। মন্দ কি। বেশ রেসপিকটেবল জব। কি বল প্রতাপ। আজকাল শিল্পের যুগ। এই তো চাই এখন।

প্রতাপ দাদার দিকে চেয়ে আছে।

প্রদীপ কি ভেবে জবাব দেয়—দেখি যদি এম. এসসি. পড়ি, না

হয় দু-একদিনের মধ্যেই ফর্মটা ফিল আপ করে দোব। কয়েকটা সার্টিফিকেটও চাই বলছে। যোগাড় করতে হবে।

বিক্রম বলে ওঠে—ওর আবার ভাবনা। লোহা কোম্পানির জি. এম. ই. দিয়ে দেবেন তোমাকে সার্টিফিকেট। আমাদের বংশের ছেলে তাকে এখানে চেনে না কে?

প্রদীপ বিক্রমনারায়ণের দিকে চেয়ে থাকে। ক-বছরেই ওর দেহমন, কথাবার্তা, চালচলনে একটা কাঞ্চনকৌলিন্য ফুটে উঠেছে। তার পাশে প্রতাপনারায়ণকে দেখে মনে হয় ওই বয়সে ঢের বড়, চোখেমুখে বয়সের ছাপ, মনের হতাশা কেমন কালো বিষণ্ণ একটা দাগ এনেছে।

প্রদীপকে কি এক পরীক্ষায় ফেলে গেল বিক্রম। সীতাও ভাবছে ছেলের ভবিষ্যতের কথা। ভাবতেও ভাল লাগে। রাস্তায় দেখে কত সুন্দর সুন্দর গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে প্রদীপের বয়সীই কত ছেলে এখানকার বড় চাকুরে দল।

তার ছেলেও ওদের মত খ্যাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অমনি সতেজে ঘুরে বেড়াবে এ মাটির বুকে। সীতা কেমন যেন স্বপ্ন দেখে মনে মনে।

ফর্মটা ফিলআপ করার কথা নিয়ে যেন একটা চিন্তায় পড়েছে প্রদীপ। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

প্রতাপনারায়ণ চুপ করে থেকে বলে ওঠে—যা ভাল বোঝ করো প্রদীপ, ওর মধ্যে আমি নেই।

সব যেন তার কাছে তালগোল পাকিয়ে যায়।

প্রদীপের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে ব্যাপারটা, বিক্রম যেন সাময়িক একটা ধাপ্পাই দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চায়। বলে ওঠে—

—পিছনের দরজা দিয়ে আমি ঢুকবো না বাব', যোগ্যতা থাকে সামনে দিয়েই যাবো মাথা উঁচু করে।

প্রতাপনারায়ণ কথা বলে না, ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। প্রদীপের চোখেমুখে একটা উজ্জ্বল্য।

প্রদীপ বের হয়ে যেতেই বিক্রমনারায়ণ যেন অন্য মানুষে পরিণত হয়। আজ হাজারো মজুর সমবেত হয়েছে গেটে, একটা জবাব তাদের দিতে হবে। নইলে কাল থেকে বয়লারে আগুন নিভে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে চালু কারখানা। এরা লকআউট করে দেবে।

ওদের রুজিরোজগার বন্ধ। রাস্তার ধারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে উপবাস দিতে হবে। মালিকরাই কেড়ে নিয়েছে তাদের রুটি। পথে আসবার সময় দেখেছে বিক্রমনারায়ণ। ওদের কোটরগত শীর্ণ চোখের চাহনিতে কেমন মরিয়াভাব। চুপ করে তারাও সহ্য করবে না এই জুলুম। বিক্রম বলে চলেছে।

—ওদের দেখে কেমন ভয় লাগে প্রতাপ, যদি গায়ে হাত তোলে? তার জন্যও তৈরী হয়েছে তারা।

প্রতাপনারায়ণ চমকে ওঠে কথাটা শুনে। ক-বছরেই এতখানি বদলে যাবে ওই অনা, ভোলা মাঝির দল যে এতদিনের পরিচয়টুকু ভুলে যাবে। চৌধুরীবংশের তার ভাই-এর গায়ে প্রকাশ্যে হাত তুলবে কালীপুরের বাজারের পথে ওরা!

কথা বলে না প্রতাপ, উঠে দাঁড়াল। সারাদেহে চঞ্চল রক্তস্রোত বইছে। ফরসা মুখচোখ রাঙা টকটকে হয়ে ওঠে। স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—

—চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসছি।

নেমে গেল প্রতাপ। সীতা খবর পেয়ে এগিয়ে আসে। প্রতাপ তার আগেই বিক্রমকে নিয়ে নীচে নেমে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

অসহায় ব্যর্থতায় চেয়ে থাকে সীতা ওদের দিকে। গাড়িখানা বের হয়ে গেল, গাছগাছালির আড়ালে আর দেখা যায় না ওদের।

সীতা অসহায় দৃষ্টি মেলে কর্মব্যস্ত ওই পথ দূরের চড়াই-এর নীচে

শালবন ঢাকা কালীপুরের চিমনীগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। কেমন যেন অসহায় একা মনে হয় নিজেকে।

শীলা কালকের সেই দুপুরের দৃশ্যটা ভোলেনি। একনজর দেখেছে মাত্র। কেমন যেন মনে ঝড় আনে। ব্যাকুল দুর্বার সেই ঝড়। এখানে এসে সে খোঁজ করেছে বন্দীপুরের জমিদারদের সম্বন্ধে। বিক্রমনারায়ণ ওবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে এসেছে। বিষয়সম্পত্তি প্রতাপনারায়ণ যা কিছু পেয়েছিল সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। পড়ে আছে ধ্বংসস্তূপের মত বাড়িখানা খানিকটা জঙ্গলের মধ্যে। দু-দিন পরই ধ্বসে পড়বে সবাই ভুলে যাবে ওদের কথা।

আজ নীরেশের নিকট সান্নিধ্যে এসে শীলার মনে একটা আলো জেগেছে। জেগেছে বিচিত্র একটি আশার সুর। মনে মনে সে আজ তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। তার জীবনের পথ, এবার আর ভুল সে করবে না। এমনি চাকরি আর কঠিন নীরস জীবনের কোন মাধুর্য তার কাছে নেই। নারীর চিরন্তন কামনাই বড় হয়ে উঠেছে একজনকে কেন্দ্র করে—তাই সেই শান্তির স্বপ্ন দেখা জীবনে কাল ক্ষণিকের জন্য ওকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল শীলা।

মন থেকে যাকে ঝেড়ে মুছে ফেলেছে তাকে আজ অবান্তর বলেই মেনে নিয়েছে। প্রদীপকে সে ভুলে গেছে।

এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোতে ভিড় লেগেই আছে সর্বদা। দলে দলে ছেলেমেয়ে আসছে চাকরির সন্ধানে। ওদের দেখলেই চেনা যায়। স্টেশন প্ল্যাটফরমে রাত কাটায়—হোটেলে খায় আর এখানে ধরনা দেয় ওরা চাকরির সন্ধানে। চোখেমুখে করুণ দৃষ্টি। একটি পরিবারের সমবেত হতাশা ওদের প্রত্যেকের চোখে।

হঠাৎ তাদেরই ভিড় থেকে প্রদীপকে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে

যায় শীলা। তাহলে ঠিকই শুনেছিল। আজ প্রদীপকেও এখানে খোঁজ নিতে আসতে হয়েছে চাকরির জন্য। সব হারিয়ে ওরা পথে নেমেছে। ওর ক্লান্ত চেহারার কাছে নীরেশের মুখখানা আরও বলিষ্ঠ, আজকের দিনে নীরেশই তার কাছে বড়।

প্রেম আর স্বপ্ন—ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে হাসি আসে। বিরাট জীবনের মাঝে দাঁড়িয়ে আজ পদে পদে অনুভব করেছে অর্থ আর প্রতিষ্ঠা চাই জীবনে। নিছক স্বপ্নের কোন দাম নেই।

তাই প্রদীপকে আজ চেন না—সাধারণের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটি মানুষ। বাইরের করিডরে দাঁড়িয়ে নোটিশ বোর্ডের লটকানো চাকরির বিজ্ঞাপন পড়ছে কাঙালের মত। সারা দেহমনে প্রদীপের এসেছে একটা পরিবর্তন। আগেকার সেই উদ্দাম ভাবও যেন নেই। এই প্রদীপকে শীলা কোনদিনই ভালবাসেনি। জীবনের কাছে কোথায় যেন মাথা নীচু করা একটি অতি সাধারণ প্রাণী।

এই প্রদীপ। হাজারো বেকারের ভিড়ে মিশে গেছে। আজ ওকে ঠিক পরিচয় দিতেও চায় না শীলা। তাই নড়াবার জন্যই শীলা উঠে ভিতরে চলে গেল; আজ এ প্রদীপকে চেনে না সে।

হতাশ হয়েছে প্রদীপ এখানে এসে। এদিক ওদিক খোঁজ করেছে কার সন্ধানে। অপিসের হলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে খুঁজেছে, শীলার দেখা পায়নি।

—কাকে চান মশাই?

প্রশ্ন করে কে একজন ভদ্রলোক। আমতা আমতা করে প্রদীপ, আসল কথা চেপে গিয়ে জবাব দেয়,

—একটা চাকরি-বাকরি।

—ওই দিকে যান। এখানে নয়। সবার মুখে-চোখে ওই এক ভাষা, কখনও নীরব কখনও সরব।

গজগজ করে ভদ্রলোক—যত মড়া এসে জুটেছে কালীপুরে। চাকরি আর চাকরি !

সরে গেল প্রদীপ। এদিক খুঁজেও কোন পাত্তা পায় না।

শীলাকে খুঁজে পায় না সে।

প্রদীপ চলে যেতে শীলা রিটায়ারিং রুম থেকে বের হয়ে আসে। ওর কাঙালপনা আজ অসহ্য বলে মনে হয়। অসহ্য মনে হয় একশ্রেণীর পুরুষের এই ব্যবহার। নীতাদির স্বামীকে দেখেছে স্ত্রীর রোজগারে বসে বসে খায়। ডেসপ্যাচ সেকশনের মালতীর বরও তাই।

প্রদীপ আজ চাকরির সন্ধানে ঘুরছে—বেকার। তাই হয়তো শীলাকে খুঁজছে। দেখা না করে এড়িয়ে গেল শীলা। লাঞ্চ খেতে যাবে কোম্পানির গাড়িতে হোটেলে, আবার ফিরে আসবে ছুটোর পর। গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। একদল মেয়ে হৈ চৈ করে অপিস বাসে উঠছে।

প্রদীপ শীলার দেখা পায়নি, একটা সত্য আবিষ্কার করেছে। বিক্রমনারায়ণ, প্রতাপ মা আর তাকে ধাপ্পাই দিয়ে এসেছে। বিভাগীয় বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিয়েছে বিদেশে পাঠাবার আর কোন কোন স্কীম তাদের নেই। এখানে এপ্রেন্টিস হয়ে থাকতে হবে চার বছর, পরে অন্য কথা। বিক্রমের কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা —এসেছিল কার্যসিদ্ধি করে নিয়ে যেতে ওই আশা দেখিয়ে সেই মতলবটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে প্রদীপের কাছে।

হঠাৎ সামনেই রাস্তার ধারে একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে নাড়াচাড়া করছে, কেমন যেন বিগড়ে গেছে ইঞ্জিন। গাড়ি অচল হয়ে গেছে।

কারখানার স্টাফ কার। বাবুরা লাঞ্চ টাইম পার হয়ে যেতে দেখে ড্রাইভারের ওপর তম্বি জুড়েছে। বাকবন্ধ করে সে বেচারী ইঞ্জিনের কি মেরামত করছে। কেউ কেউ নেমেছে গাড়ি থেকে,

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে হালকা শালবন। বাতাসে কাঁপছে, কচি পাতা, মহুয়াগাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে। বাতাসে মহুয়ার সৌরভ। রোতভাতা মাটি আর বনভূমি।

হঠাৎ চোখ পড়ে একটি মেয়ের দিকে। শীলা।

সাইকেল থেকে নেমে প্রদীপ এগিয়ে যায়। শীলা এতক্ষণ এড়াবার চেষ্টা করে যেন ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে। ওকে আসতে দেখে কঠিন হয়ে ওঠে একটু। রোদে হাঁপিয়ে উঠেছে;

—কেমন আছো? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রদীপ। দুপুরের রোদ কোথায় মেঘে ঢাকা পড়ে শান্ত মধুর হয়ে আসে। শালবনে কিসের সৌরভ।

—ভালোই। ছোট জবাব দিয়ে এগিয়ে যায় শীলা গাড়ির দিকে। যাত্রীরাও উঠে বসেছে ইতিমধ্যে।

ইঞ্জিন মেরামত হয়ে গেছে। স্টার্ট নিয়ে বের হয়ে গেল গাড়িটা। একা রাস্তায় তীব্র রোদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে প্রদীপ। সবাই কোথায় কি হারিয়ে গেছে। হু হু ঝড় বইছে, উত্তপ্ত হাওয়ার হলকা সারাদেহে জ্বালা ধরায়। চুপ করে সাইকেলে উঠল।

চারিদিকে অপরিসীম এক শূন্যতা—রোদকাঁপা গাছ-গাছালির সীমা ঘেরা রাস্তাটা রোদে কাঁপছে দূরে মরীচিকার অফুরন্ত অথবা শান্তিবারির সংকেত নিয়ে।

সবাই প্রতারিত করেছে তাকে। বিক্রমনারায়ণ—শীলা পর্যন্ত। সেই জ্বালা আর হতাশা যেন ছিটিয়ে পড়েছে তাম্রাভ রৌদ্র আর আর আগুনের ঝলকামেশা চৈত্রী হাওয়ায়। কালবৈশাখীর প্রস্তুতি চলেছে আকাশ-বাতাস।

কালীপুরের দিকে এগিয়ে চলে প্রদীপ। কোন দিকে যেন কোন পথই তার নেই—নেই কোন ছায়াঘন শান্তিনীড়। শুধু আগুনের হুহু জ্বালাধরানো পৃথিবী তার চারিদিকে।

কেমার কোম্পানির পাঁচিলঘেরা মেন ওয়ার্কশপের বিস্তৃত এলাকার মধ্যেই একদিকে অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে ডিরেকটার্স বাংলো। গভীর জলভরা একটা পুকুরে ঘাটটা বাঁধানো। চারিদিকে সবুজ বেড়াগাছের আবেষ্টনী। ইট-কাঠ ভাঙা স্তূপের একপাশে দোতালা সাজানো বাংলোতে বিক্রমনারায়ণ বাস করে। গ্রীষ্মকালে আকাশ-বাতাস তেতে ওঠে—বিক্রমনারায়ণ অনেক খরচ করে এয়ারকুলার লাগিয়েছে—দুটো বড় বড় ফ্রিজিডেএয়ার বসানো হয়েছে মালিকের তৃষ্ণায় হিমশীতল পানীয় যোগাতে।

বোগেনভিলা—ক্যানা—গ্রাণ্ডিফ্লোরা গাছের পিছনেই বেশ কিছু টাকা অপব্যয় হয় তার প্রতিমাসে। গ্যারেজে দু-খানা ঝকঝকে গাড়ি। আরামেই আছে বিক্রমনারায়ণ। জমিদারি চলে যাবার দুঃখ এতটুকু বাজেনি তার বুকে। গেছে একগুণ, পুষিয়ে নিয়েছে বহুগুণে সুদ-আসলে। সে কি করে বুঝবে হাজারো শ্রমিকের কষ্ট, মাথার উপর এতটুকু আশ্রয় না থাকার বেদনা।

আজ একটু বিপদে পড়েছে স। চিরাচরিত নিশ্চিন্ত জীবনের আরাম উপভোগ বাগড়া দিয়েছে শ্রমিকের দল।

রাত্রি থেকে শ্রমিকরা দুটো গেটেই কড়া পাহারা বসিয়েছে। ঢোকবার বেরুবার উপায় নেই। তারা ক্রমশঃ দলে বেশী হয়ে গেটের চারপাশ ছেয়ে ফেলেছে। লকআউট করেছে কোম্পানি তাদের বের করে দিয়ে। বয়লারে কয়লা দেবার জন্য লোক আছে, আর কেউ নেই। বিরাট সীমানা ফাঁকা—শেডগুলো, স্থির যন্ত্রপাতি দেখে মনে হয় যেন কোন ভূতের রাজ্য। কারখানার ভিতর ছেড়ে বাইরে গেটে স্থির হয়ে বসে আছে শ্রমিকরা—নানা গুজব রটে। কেউ বলে—মালিক নিজে বের হয়েছে, শেঠজীর কারখানা থেকে কয়েকশো মজুর মিস্ত্রী এনে কাজ চালাবে। কেউ বলে—রাতের বেলায় গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে মেরে হটাবে তাদের। তবু তারা নড়ে না।

অনুকূল চুপ করে বসে ছিল। নানা গুজবে ওদের মনের জোর কমে আসছে। বলে ওঠে কে একজন,

—আনলেই হলো। বড়বাবুকে তাহলে আস্ত রাখবো নাকি।

ভোলা মাঝি গজরাচ্ছে—আর নটবর মুখুয্যে! ওটাকে আমিই কোনদিন টুঁটি টিপে মেরে দোব এখানে এলে। মরেছি না মরতে বাকী আছি। একসঙ্গে মরবো।

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ওরা ঠায় বসে আছে। মেজাজ হয়ে উঠেছে তেমনি রুক্ষ, পাগলা কুকুরের মত।

পুলিসদল টহল দিয়ে গেল একবার গাড়িতে করে। ওরাও যেন ক্ষেপে ওঠে—লালপাগড়ি আসছে বড়বাবু!

অনুকূল দাঁড়িয়ে পড়ে—আসুক। আমরা নড়ব না। কাউকে ঢুকতে দোব না।

—নিশ্চয়! সমবেত কণ্ঠে ওরা গর্জে ওঠে।

কারখানার প্রবেশ পথ আটকে বসে আছে ওরা ঢোকা বেরুনো নিষেধ। চালাক কেমন করে ওরা অন্য লোক দিয়ে কারখানা চালাবে।

হঠাৎ কয়েকখানা গাড়ি এগিয়ে আসে এই দিকে। পিছনে দুটো খোলা ট্রাক বোঝাই মজুর। লালধুলো উড়িয়ে এসে গেটের থামল তারা। অনুকূল ভোলা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওদের গুজব সত্যি। নবীনবাবু কাউকে কিছু না বলে শেঠজীর কারখানা থেকে মজুর এনেছে। ওরাও রুখে দাঁড়িয়েছে।

—জান কবুল, কাজ করতে যেতে দোব না কাউকে।

সমস্বরে গর্জে ওঠে কয়েক শো মজুর। রোদে জলে ওদের চেহারা হয়ে উঠেছে রুক্ষ, কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গেছে।

নবীনবাবু গর্জে ওঠে—বেআইনী অত্যাচার করছো। পুলিস এসে লাঠি চালাবে, দরকার হলে গুলিও। সরে যাও তোমরা নইলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো।

প্রতাপনারায়ণ এসব ব্যাপারের আগাগোড়া ইতিহাস কিছুই জানতো না। বিক্রম তাকে সমস্তই ঠিক ঘটনাটা বিকৃত করে শুনিয়েছে, তাকে উত্তেজিত করে তুলেছে, বিক্রম বেশ জানতো যে কোন রকমে একবার প্রতাপকে অনাডোম, ভোলা মাঝিদের সামনে এনে ফেলতে পারলে ওরা মাথা নিচু করে এসে প্রতাপের সামনে দাঁড়াবে। ব্যাপারটার একটা মীমাংসাও হয়ে যাবে। তাই প্রতাপকে উত্তেজিত করে গাড়িতে তুলে এনেছে একেবারে কারখানার গেটে।

ইতিমধ্যে শেঠজীর কারখানা থেকেও কিছু মজুর বেশী রোজ দেবার প্রতিশ্রুতিতে নিয়ে এসেছে বিক্রম আর নবনী। প্রতাপের সঙ্গে ওদের কোন রকমের ফ্যাক্টরীর গেট পার করে ভিতরে ঢোকাতে পারলেই ওরা কাজ চালাতে পারবে, ধর্মঘট আর কোনমতেই টিকবে না।

কিন্তু কাছাকাছি এসে ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো হয়ে ওঠে। বিক্রমনারায়ণের গাড়ি ঘিরে ফেলে তারা, আজ মরীয়া শ্রমিকদল উত্তেজিত হয়ে ইট পাথর ছুড়ছে ঝন ঝন করে গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন, ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। চারিদিকে কলরব উত্তেজিত জনতার চীৎকার, বিক্রম গাড়ির ভিতর ভয়ে বিবর্ণমুখে কাঁপছে।

চমকে ওঠে প্রতাপনারায়ণ এইভাবে অতর্কিতে আক্রান্ত হতে। যৌবনের ফেলে আসা দিনগুলো মনেপড়ে। আজও মরেনি প্রতাপ। সমস্ত দেহ উত্তেনায় কাঁপছে। গাড়ির দরজাখুলে বের হয়ে এল প্রতাপনারায়ণ। রাগে অপমান লাল হয়ে উঠেছে মুখচোখ।

সামনেই দেখে অনা ডোম, ভোলামাঝি কি যেন চীৎকার করে বলে চলেছে; হঠাৎ ছোট হুজুরকে দেখে চমকে ওঠে তারা।

মাথা উঁচু করে দীর্ঘদেহী পুরুষ বন্দীপুরের চৌধুরীবংশের সন্তান আজ কালীপুরের প্রজাদের যেন দেখা দিতে এসেছে। বাতাসে উড়ছে ওর চুলগুলো।

—অনুকূল। ভোলা।

প্রচণ্ড সেই সতেজ কণ্ঠস্বরের ডাক—অতিপরিচিত ওই আহ্বান। হারানো অনুকূল ভোলা মাঝির স্বরূপ যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। অন্নদাতা তাদের সামনে।

জনতা হঠাৎ ওই আবির্ভাব আর প্রচণ্ড হুংকারে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। অনা ডোম এগিয়ে এসে গড় করে, পিছু পিছু ভোলা মাঝিও। উত্তেজিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত থেমে যায়।

—ছোটহুজুর। অনা ডোম দাঁড়াল সামনে।

—একি করছিস তোরা?

হাত জোড় করে বলে ওঠে অনা ডোম—হুজুর, পেট বড় বালাই। সেদিন আপনাদের দরজায় খেতে পেয়েছি, আজ এখানে গতর পাত করেও দু-বেলা আধপেটা পেছি না—তাই

—পথ ছাড় ভিতরে যাবো। সেইখানে আয় কথা হবে। প্রতাপনারায়ণ এগিয়ে যায়।

জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন ওঠে। বাধা দিতে যায় অনা। নিজের জন্য নয় ওরা ক্ষেপে আছে।

—হুজুর, যাবেন না।

একবার দাঁড়াল প্রতাপনারায়ণ; রোদে ফরসা রং টকটকে হয়ে উঠেছে। অনা ডোম আজ তাকে বাধা দেবার স্পর্ধা রাখে। কথাটা ভেবেই চমকে উঠেছে প্রতাপ।

আগেকার দিনগুলো মনে পড়ে—মাথা উঁচু করে কালীপুরের মধ্যে দিয়ে গেছে; সামনে কাউকে গড় করতে না দেখলে ঘোড়া থেকে নেমে কাছে ডেকে নিয়ে জুতো মেরেছে। আজ তাকে বাধা দেয় ওই জুতোর চাকর অনুকূল? গর্জন করে ওঠে প্রতাপনারায়ণ।

—সরে যা অনা!

হঠাৎ কোন্ দিকে কি হয়ে গেল বোঝা গেল না। থমকে দাঁড়াল প্রতাপনারায়ণ। বিক্রমনারায়ণ নবনীবাবু এমনিই একটা কিছুর অনুমান করেছিল। ধূর্ত নটবর সরে আসে আগে থেকেই। মুহূর্ত মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে যায় কোন দিক কেউ জানে না।

প্রতাপনারায়ণের কপালে এসে লেগেছে একটা ছোট ইট। সাদা পাঞ্জাবিটায় ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু রক্তধারা। উত্তেজিত জনতা রক্ত দেখে চমকে উঠেছে—মেতে উঠেছে। চীৎকার করছে আবার মারমুখী জনতা।

—খুন করো দালালকে।

অনা ডোম ছোটহুজুরের রক্ত দেখে ব্যাকুলকণ্ঠে উত্তেজিত জনতাকে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে। কে কার কথা শোনে। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে বিশৃঙ্খল জনতা। ইট পাথর পড়ছে। কাদের আর্তনাদ কানে আসে।

ভোলা মাঝি, অনুকূল, দুগাই লোহার আরও ক-জন ঘিরে ফেলে প্রতাপনারায়ণকে। কোনরকমে বের করে আনবার চেষ্টা করে।

এর পরই কাণ্ডটা ঘটে যায়। গোলমাল দেখে নবনী মিত্র ক্ষেপে ওঠে। মিলগেট ভেঙে ওরা ঢুকবে এইবার ভিতরে। মিল দখল করে নেবে ওই জনতা, ভেঙে তছনছ করে আগুন ধরিয়ে দিতেও দ্বিধা করবে না। সুতরাং ওরাও চরম পন্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। বিক্রম চীৎকার করে বাধাদেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা মেতে উঠেছে নটবরও সায় দেয়। জননেতা নটবর গিয়ে উঠেছে পুলিসের নিরাপদ আশ্রয়ে।

কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে জনতা ছত্রভঙ্গ করবার চেষ্টা করার পর জনতা ক্ষেপে উঠতে বাধ্য হয়েই গুলি চালিয়েছে। এলোপাথাড়ি গুলির শব্দে ভরে ওঠে কালীপুরের আকাশ-বাতাস। স্টেশনে জমেছে জনতা। বাসগুলোকে থামিয়ে দিয়েছে বাইরের রাস্তায়। চারিদিকে একটা জমাট আতঙ্ক জেগে ওঠে।

কালীপুরের আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে ওদের কাতর আর্তনাদে বেরুবার পথ নেই বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলি চালিয়েছে। হতাহতের সংখ্যা ঠিক জানা যায়নি। দূর থেকে চেয়ে থাকে ওই মৃত্যুপুরী দিকে নবনী মিত্র—বিক্রমনারায়ণ—শেঠ ভালোটিয়ার দল।

কালীপুরের আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে মেয়েছেলে আহতের কান্নায়। সব আন্দোলন যেন ক্ষণিকের জন্য থেমে গেছে। চাপা পড়ে গেছে ওই গর্জনধ্বনি ওদের কাতর কান্নায়।

শিউরে ওঠে কালীপুরের লোকজন। প্রথম আজ এই রক্তপাত ঘটল কালীপুরের মৃত্তিকায়, বনভূমিও শিউরে উঠেছে অজানা আতঙ্কে।

প্রদীপ ফিরছিল কালীপুরে। লেভেলক্রসিং-এর মোড়ে জমেছে বহু গাড়ি, বাস, লরী—লোকজনের মুখে আতঙ্কের ছায়া। নানা গুজব রটে যায় এরই মধ্যে। কালীপুরে গুলি চলেছে। কে বলে ওঠে।

—কয়েক শো লোক মরবে।

—একেবারে ছাতুফুটো করে দিইছে বাবা। রং চালাকি ওই কোম্পানির সঙ্গে। বোঝ ঠ্যালা ইবার।

—কি হয়েছে? প্রদীপ ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

আকাশ-বাতাসে ভেসে আসে গুলির শব্দ। কাদের কলকল্লোল ছাপিয়ে ওঠে হাজারো কণ্ঠের ব্যাকুল কান্না আর আর্তনাদ। নিস্তব্ধ দিগন্ত কাঁপিয়ে উঠছে দু-এক রাউণ্ড গুলির শব্দ।

সাইকেল ঠেলে এগিয়ে আসে প্রদীপ গেট পার হয়ে। ভীত জনতা ছুটোছুটি করছে—দোকানপসার সব বন্ধ হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশের গাড়ি ছুটে চলেছে ওই দিকে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক জমায়েত হয়ে গেছে। কারা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিকে। ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল স্টীল কারখানার একখানা এ্যাম্বুলেন্স; পুলিসের গাড়িও।

প্রদীপের দিকে চেয়ে দু-একজন মুখচেনা লোক কি যেন বলাবলি চাপা কণ্ঠে। প্রদীপ ও সাইকেল ঠেলে এগিয়ে চলেছে কি যেন দুর্বার আকর্ষণে ওই ঘটনাস্থলের দিকে।

গর্জনধ্বনি থেমে গেছে। রাস্তার ধুলোয় জমে আছে ঠাঁই ঠাঁই রক্তের দাগ। কাদের অস্ফুট আর্তনাদের শব্দ কানে আসে। বিক্রমকে এগিয়ে আসতে চমকে ওঠে প্রদীপ। ওরা ভিড় করেছিল— ওকে দেখে পথ ছেড়ে দেয়। অনাডোমের দুচোখে আজ জলধারা, কাঁদছে ভোলামাঝি।

স্তব্ধ হয়ে গেছে ওরা, প্রদীপ চমকে ওঠে।

একপাশে পড়ে আছে প্রতাপনারায়ণের প্রাণহীন দেহ, সাদা পাঞ্জাবি ধুতি ভরে গেছে রক্তে। গুলি লেগে মারা গেছে ভিড়ের মধ্যে প্রতাপনারায়ণ—কালীপুরের ছোট হুজুর।

ওরা শিউরে উঠেছে। প্রদীপের দু-চোখের সামনে নামে জমাট অন্ধকার। কোথায় যেন বলে বলে ঝড় উঠেছে, সব ভেঙে ফেলার ঝড়। আজ হঠাৎ যেন চমকে উঠেছে প্রদীপ জীবনের পরম কঠিন একটি নিষ্ঠুর সত্যকে আবিষ্কার করে। প্রতাপনারায়ণকে ওরা হত্যা করেছে।

বিক্রম নবনী মিত্র নটবরের দল আজ তাই প্রতাপের মৃতদেহের পাশে আসেনি। এসে দাড়িয়েছে সেই অতীতের মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তারই চিরসঙ্গী অনাডোম—ভোলামাঝির দল।

—বাবা। প্রদীপ অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে।

কাঁদছে অনা ডোম—দুর্ধর্ষ সেই লোকটা,

হুজুরকে ওরা গুলি করে মেরেছে দাদাবাবু!

প্রদীপ কথা বলে না, মৃতদেহের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল।

ওই আহত মৃত লোকগুলোর দিকে চেয়ে আছে জনতা, চেয়ে আছে ধ্বংসযজ্ঞের পানে।

সব যেন অসীম শূন্য বলে মনে হয়। চারিদিক থেকে বায়ুশূন্য

একটা মহা শূন্যের প্রবল চাপ তাকে নিষ্পেষিত করে দিতে চায়। কোন আশা আনন্দ আশ্রয় কোথাও নেই। শীলা গেছে—প্রদীপ আজ একা; পথ! পথের সন্ধান যেন সে পেয়েছে আজ।

প্রতাপনারায়ণই দিয়ে গেছে সেই পথের সন্ধান।

নিষ্ঠুর হত্যাকারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে বন্দীপুরের শেষ জমিদার প্রতাপনারায়ণ। কালীপুরের আদিম অরণ্যের বাঘ যাকে ভয় করতো—ভয় করতো নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকারীর দল যাকে সেই প্রতাপনারায়ণ আজ প্রাণ দিয়েছে ওদের গুলিতে। পরাজিত হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে আজকের লুণ্ঠনকারীদের কাছে। জিতেছে বিক্রমনারায়ণ নবনী মিত্র নটবরের দল।

বিক্রমনারায়ণ এগিয়ে আসে, কণ্ঠস্বরে বেদনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে—কি সর্বনাশ হয়ে গেল প্রদীপ।

প্রদীপ গর্জে ওঠে—থামুন আপনি। আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আজ তাঁকে হত্যা করেছেন, আপনারাই দায়ী ওঁর মৃত্যুর জন্য পুলিশের কাছে সেই কথাই বলবো। হকচকিয়ে ওঠে বিক্রম যেন সব সত্য ফাঁস হয়ে গেছে।

সামলে বলে—কি বলছো এসব কথা। ধৈর্য ধরো—এসময় জ্ঞান হারাতে নেই। মহাগুরুনিপাত।

বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে আসে বিক্রমনারায়ণ, কিন্তু প্রদীপের সামনে থমকে দাঁড়াল। জামা কাপড়ে ওর প্রতাপনারায়ণের রক্তের দাগ—দু-চোখ জ্বলছে নৃশংস একটা প্রতিবাদের কাঠিন্যে, এগোতে সাহস পেলে না বিক্রমনায়ণ।

•

কাগজে কাগজে বের হয়েছে কালীপুরের নৃশংস হত্যা লীলার সংবাদ। ধিক ধিক আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। একা কেমার কোম্পানির শ্রমিকরা নয়—কোম্পানির ওই নিষ্ঠুর ব্যবহারের

প্রতিবাদে সারা কালীপুরে আজ সাড়া পড়ে গেছে। দোকানপাট কারখানা বন্ধ।

প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। কালীপুরের স্তব্ধ নম্র শোষিত জীবনযাত্রায় এনেছে প্রাণের বন্যা, প্রতিবাদের দৃঢ়তা। বিক্রমনারায়ণের তূণে আর কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে দেশজোড়া ওই বিক্ষোভকে থামাতে পারে—ওদের কণ্ঠরোধ করে দিতে পারে।

প্রদীপ অকস্মাৎ যেন পথ পেয়েছে। রুদ্ধ জীবনের মুক্তিপথ তার সামনে আজ খুলে যায়—যে পথ চলে গিয়েছে ত্যাগ আর দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে একটি অখণ্ড বিরাট পাওয়ায়। শীলাকে পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ এতে—একটি জীবন মহাজীবনের স্রোতে মিশে গেছে।

বসন্তের কথা মনে পড়ে।

বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছে বুভুক্ষু শ্রান্ত দুটি মানুষ, বন্দীপুরের বনের আতঙ্ক সেই অনা ডোম আর ভোলা মাঝি, মাঝখানে চলেছে প্রদীপনারায়ণ। আজ সব হারিয়ে সে পথ পেয়েছে এই হাজারো জনতার সান্নিধ্যে। উস্কখুস্ক চুল—ফরসা টকটকে রং রোদের আভায় উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

বলিষ্ঠ কণ্ঠে ওর ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের সুর।

সীতা ছাদ থেকে চেয়ে থাকে ওর দিকে। একটা ছবি ভেসে ওঠে তার মনে—অতীতের একটা ছবি।

কালীপুরের আদিম অরণ্য থেকে বহুবার যুবক প্রতাপনারায়ণ ওদের সঙ্গে নিয়ে মেরে এনেছে বিরাট বাঘ-ভালুক। বনের ত্রাস সৃষ্টি করেছিল প্রতাপ।

আজ আবার যেন সে ফিরে এসেছে নবযৌবনস্পর্শ নিয়ে ওই প্রদীপের মধ্যে নতুন রূপে।

চোখ মুছে চেয়ে থাকে ওদের দীর্ঘ কল্লোলমুখর শোভাযাত্রার

দিকে। প্রতাপনারায়ণ মরেনি, বেঁচে আছে প্রদীপের মধ্যে নূতন রূপে।

বাংলোর ছাদ থেকে চেয়ে থাকে বিক্রমনারায়ণ—সেও চমকে উঠেছে প্রদীপকে ওদের মধ্যে দেখে। বন্দীপুরের চৌধুরীবংশের পুরোনো প্রাসাদ ধ্বসে গেছে চুরমার হয়ে। বিক্রম সেই বংশের কেউ নয়, গোত্রান্তরিত হয়েছে সে।

ওই প্রদীপকে তারা চেনে না—ও তাদের গোত্রছাড়া নতুন একটি মানুষ।

স্টীল টাউনও আজ বন্ধ। পথচলতি লোকজন গাড়িগুলো থেমে গেছে পথের ধারে ওদের বিজয়বাহিনীকে পথ ছেড়ে দিতে। নীরেশও বের হয় বেড়াতে, শীলা আর নীরেশ।

গাড়ির মধ্য থেকে চেয়ে থাকে শীলা—প্রদীপকে আজ নতুন চোখে দেখে সে। বিরাট একটি আগামী দিনের মানুষ—অনেক দূরের মানুষ, তাকে আজ ধরা যায় না।

একটি দিনের মধ্যেই আমূল বদলে গেছে প্রদীপ—যার প্রস্তুতি চলেছিল এতদিন তার মনে মনে, সারা কালীপুরের জীবনে।

শীলার দিকে আজ ফিরে চাইল না প্রদীপ, চাইবার সময় তার নেই। সে জীবন কোথায় হারিয়ে গেছে।